

পাহাড়ি বাঁকের ইতিকথা - লাটপাঞ্চারে - আলোকচিত্রী রাজমিতা চ্যাটার্জী

আমাদের ছুটি – ৩৬শ সংখ্যা





বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংনা ই-ম্যাগাজিন

व्याभाष्ट्रत वारमा

আমাদের দেশ

याभारपत्र पृथिवी

याभाट्यत कथा

১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৪২৭

ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতেন বন্য পাহাড়ি অঞ্চলের, জনশূণ্য প্রান্তর আর দুর্গম গ্লেসিয়ারের। বড় হওয়ার পর জন্মভূমি ফ্রান্সেই চর্চা করেছিলেন প্রাচ্যতত্ত্বের এবং আলাদা করে তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির। তাঁকে আকর্ষণ করেছিল পূর্বের অজানা রহস্যময় দেশগুলি - ভারত, বর্মা, চিন এবং সর্বোপরি তিব্বত। শুধুমাত্র তিব্বতেই গিয়েছেন পাঁচবার যার মধ্যে শেষবার নিষিদ্ধ অঞ্চল লাসায়। দুর্গম লাসায় সেই প্রথম কোনও বিদেশি মহিলার পদচিহ্ন পড়ল।

১৯১০ সালে প্রথম পুবের পথে যাত্রা করেন আলেকজান্ডার ডেভিড নীল। এইসময় চিনের সঙ্গে গন্ডগোলে তিব্বতের শাসক দালাই লামা এসে ভারতের কালিম্পং- এ আশ্রয় নেন। অনেক চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ডেভিড নীল। ১৯১২ সালে সিকিমের দিক থেকে প্রথমবার তিব্বতে পা রাখেন তিনি। রহস্যময় তিব্বতের পাহাড়,গিরিপথ,ভূ- প্রকৃতির পাশাপাশি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতি।পুরোনো পুঁথি আর বই সংগ্রহ করতেও শুরু করেন। কয়েকবছর বাদে পাঞ্চেন লামা বা তাসি লামার কাছে যান। পন্ডিত এই ব্যক্তি তাঁকে তিব্বতী সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কোনোদিনই লাসায় যে যেতেই হবে এমনটা মনে হত না নীলের। কিন্তু যখন জানলেন বিদেশিদের জন্য নিষিদ্ধ সে দেশ, তাঁর মাথায় জেদ চেপে গেল। পুত্রবৎ লামা ইয়ংদেন- এর বৃদ্ধা মায়ের ছদ্মবেশে ভালোমন্দ নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পৌঁছেছিলেন লাসা। 'মাই জার্নি টু লাসা' পঞ্চান্মবছর বয়সে ছদ্মবেশে তাঁর সেই অভিযানের কাহিনি।

লকডাউনের জেরে বেড়াতে যাওয়া হয়নি অনেকদিন, বই পড়ছিলাম একের পর এক। ওই যে একটা কথা আছে না
- 'I am forever travelling because I read'। এর মধ্যেই 'মাই জার্নি টু লাসা' হাতে এল। মুগ্ধ হয়ে পড়লাম।
নীল- এর সঙ্গে কয়েকটা দিন হারিয়ে গিয়েছিলাম একশো বছরেরও বেশি আগের তিব্বতের অজানা প্রান্তরে।

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

~ <u>আরশিনগর</u> ~

<u>ওই বাংলার মায়াভরা পথে (শেষ পর্ব)</u> – নীলিমা ঘোষ



<u>আমাদের ছুটি – ৩৬শ সংখ্যা</u>



<u>श्वित्थाना जात नाउँभाश्वातत्</u> – जरुभाठन ठ्यांठार्जी

~ সব পেয়েছির দেশ ~

<u>এক যুগ আগের সতপন্থ তালের স্মৃতি</u> <u>সুমন্ত মিশ্র</u>



<u>কালের বন্দর বন্দরের কাল</u> <u> প্রজা পারমিতা</u>

বারাণসী ও এলাহাবাদ – তপন পাল





স্বর্গীয় দেওরিয়াতাল – অরিন্দম পাত্র

~ ভুবনডাঙা ~

জাঞ্জিবারের প্রিজন আইল্যান্ড ও স্লেভ মেমোরিয়াল – অতীন চক্রবর্তী

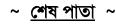


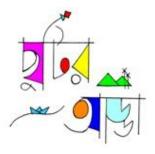


<u>णिक्षां यन्मित्तत्र (मर्ग कार्साणियां</u> – यनयः সत्रकात

সিংহল द्वीरभ - अर्थिठा সরকার জানা







বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন – গনগনি – শুলা সরকার সিল্ক রুটে – পঙ্কজ দত্ত



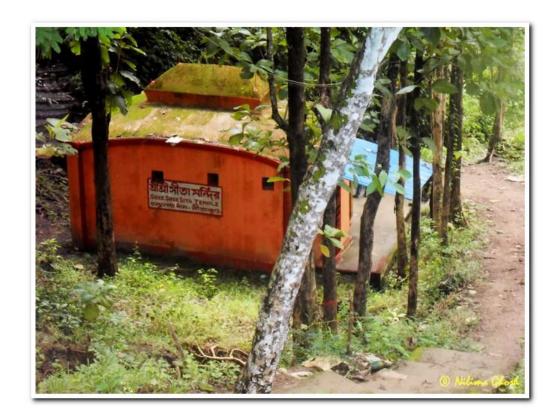
ওই বাংলার মায়াভরা পথে

নীলিমা ঘোষ

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

লোকটি একটা বাস দাঁড করালো। কন্ডাক্টরের সঙ্গে কথা বলে আমাকে বলল, যান উঠে পড়ন। খানিকবাদে একজন নেমে যাবেন, তখন আপনি বসে পড়বেন। কন্ডাক্টর আমার মালপত্র ড্রাইভারের সিটের পেছনে রেখে, ইঞ্জিনের সামনে গদিপাতা জায়গায় বসিয়ে দিল। খানিকবাদে অবশ্য ভালো জায়গাতেই বসতে পেলাম। ময়নামতী থেকে প্রায় ৩০ কিমি আগে চউগ্রামের রাস্তায় বাঁদিকে অনুচ্চ সীতাকুণ্ড পাহাডশ্রেণী। এর সর্বোচ্চ শিখর চন্দ্রনাথ। পাশের সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম. বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি থাকার হোটেল পাওয়া যাবে কিনা। বাসস্ট্যান্ডের নাম অলংকার। উনি বললেন, স্ট্যান্ডে পৌঁছবার একটু আগে নামবেন। একটা রিকশা নিয়ে নেবেন, সে আপনার পছন্দ অনুযায়ী হোটেলে নিয়ে যাবে। কয়েকটা হোটেল দেখলাম, হাজার টাকার নিচে কোনোটাই পেলাম না। শেষ হোটেল ম্যানেজার বললেন, আপনি শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম আশ্রমে যান. সেখানে কোন টাকা পয়সা দিতে হবে না। একটা রিকশা ডেকে দিচ্ছি সে পৌঁছে দেবে। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রওনা দিলাম। কৈবল্যধাম আশ্রম অফিসঘরে যথারীতি নাম-ধাম লিখিয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। তখন আশ্রমের নামগান সংকীর্তন হচ্ছে, সুন্দর পরিবেশ। বাইরে ঢাকা চাতালে বসে অনেকে তা উপভোগ করছেন। ম্যানেজার আমাকে বলেছিলেন, রাত্রে যদি খাই তবে কুপন আগে থেকে সংগ্রহ করতে হবে। প্রসাদ বিতরণের পর সাড়ে নটায় রাতের খাবার পাওয়া যায়। কুপনের মূল্য চল্লিশ টাকা। আমার তিন বেডের ঘর। প্রত্যেক বেডে আলাদা তোষক, চাদর, মশারি, গোটানো আছে। পেতে নিলেই হল। বিছানার চাদর আমার সঙ্গেই থাকে। ঘরের সংলগ্ন একটা ছোট বাথরুম ও গ্রিল দিয়ে ঘেরা বারান্দা। যাত্রী কম থাকায় আমি একাই গোটা ঘর দখল করে ছিলাম। সাড়ে নটার পর খাওয়ার ঘরে গিয়ে খেয়ে অফিসঘরের পাশে ফিল্টার লাগানো কলের জলে বোতল ভরে ঘরে ফিরে এলাম। সাধারণত তিন দিন থাকার অনুমতি মেলে. আমি একটা দিন বেশি ছিলাম।

প্রথমদিন সীতাকুণ্ড। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চন্দ্রনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। অলংকার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করতে একজন রাস্তার অপর পাড় দেখিয়ে বললেন, রাস্তা পার হয়ে দাঁড়ান, সীতাকুণ্ডের বাস ওখানেই আসবে, জিজ্ঞাসা করে উঠে পড়বেন। সীতাকুণ্ডে নেমে দেখলাম কয়েকটা স্টেশনারি দোকান। একটা কেক, বিস্কুটের প্যাকেট ও জলের বোতল কিনলাম। কিছু খেয়ে বের হইনি। কেকটা ওখানেই দোকানের বেঞ্চে বসে খেলাম। বোতল থেকে জল খেলাম। দোকানের মালিক অল্পবয়সী ভদ্রলোক আমি একা এসেছি শুনে বললেন, রাস্তা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে বাজারের রাস্তা পাবেন, ওখানে সীতাকুণ্ড যাওয়ার অটো পেয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে অল্প বয়সী এক দম্পতি অটোতে উঠলেন। ওঁরাও সীতাকুণ্ড যাবেন এবং পাহাড়ে উঠে চন্দ্রনাথ শিবলিঙ্গ দর্শন করবেন। আমাকে বললেন, আপনি কি পাহাড়ে উঠতে পারবেন? বললাম দেখি, যতটা পারি উঠব। বাঁধানো চড়াইপথে খানিক উঠে দেখি লাঠির দোকানে লাঠি বিক্রি হচ্ছে, ঘুরে এসে ফেরত দিলে অর্ধেক দাম ফেরত পাওয়া যায়। একটা লাঠি সংগ্রহ করে চড়াই ভাঙতে লাগলাম। ধীরে ধীরে সীতাকুণ্ডে পৌঁছে গেলাম।

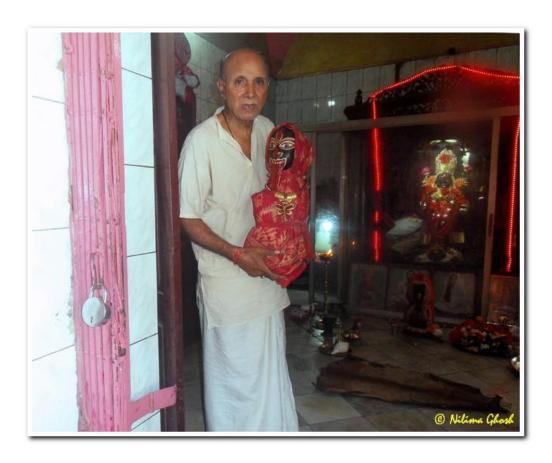


রাস্তা থেকে খানিক নিচে শ্যাওলাধরা ভাঙাচোরা ইটের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। লোককাহিনি আছে, বনবাসকালে রাম সীতা এই পাহাড়ে ভ্রমণ করতেন। নিচে একটি উষ্ণ প্রস্রবণে সীতা স্নান করতেন, তাই এই স্থানের নাম সীতাকুণ্ড। কুণ্ডটি বাঁধানো, চালাঘরের ছাউনি দেওয়া। বর্তমানে শুকনো। তখনও পুরুত মশাই আসেননি। দরজায় তালা দেওয়া। অদূরে সাদা বাঁধানো চৌবাচ্চাটি রাম লক্ষ্মণের কুণ্ড। উষ্ণপ্রস্রবণ আর নেই। তার জায়গায় তৈরি হয়েছে স্বয়ন্তু শিবনাথের মন্দির। লোকে বলে জাপ্রত দেবতা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেবতা দর্শন করলাম। ওখানে ভবানী দেবীর মন্দির আছে। আবার এগিয়ে গেলাম। এখান থেকে পাহাড়ের চূড়ো ও মন্দিরের উপরিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। যেতে যেতে দেখলাম, সামনে কংক্রিটের ঢালাই সিঁড়িপথ হয়ে রাস্তা হচ্ছে। পাশ দিয়ে সরু কাঁচা চলার পথ, গাছপালায় ঢাকা, অন্ধকার। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এখান থেকে পাহাড়ের চূড়া আরো প্রায় এক কিলোমিটারের মতো। আমি এখান থেকে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলাম। সীতাকুণ্ড ছেড়ে ফিরে যাচ্ছি, দেখলাম গেরুয়া বসনধারী এক পুরোহিত আসছেন। বললাম, আপনি কি সীতাকুণ্ডে যাবেন? বললেন, তিনি বাবা চন্দ্রনাথের মন্দিরের পুরোহিত। রোজ এই চড়াই ভেঙে ওপরে পুজো করতে যান। আমি আশ্রমে ফিরে চললাম। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল, আমার কুপন নেওয়া হয়নি, বাইরে হোটেলে ভাত খেয়ে নিলাম। পরিশ্রান্ত ছিলাম, তাই রাতের জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

প্রদিন খুব সকাল সকাল উঠলাম, রাঙামাটি যাবো। রাজবন বিহার। চউগ্রাম থেকে রাঙামাটি প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। আশ্রম থেকে অলংকার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে একটা ভ্রমণ সংস্থার কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম, এখান থেকে সরাসরি কোন বাস রাঙামাটি যায় না। আমাকে সিএনজি(অটো) করে অক্সিজেন বাসস্ট্যান্ডে যেতে হবে। সেখান থেকে রাঙামাটির বাস ছাডে। একটা অটোতে চেপে অক্সিজেন বাসস্ট্যান্ডে বাস কাউন্টারে এসে রাজবন বিহার যাব বলাতে কাউন্টার থেকে ঘাঘরা যাওয়ার টিকিট দিল। কন্ডাক্টরকে বললাম, একটু এলে বলবেন। বাসস্টপে নেমে বাঁ দিকের গলিতে আধ কিমির মত হাঁটা পথ। তবে অটোও চলে। সেদিন পূর্ণিমা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ উৎসবে ছিল। সেই গলিপথে জনস্রোতের মত মানুষ উৎসব শেষে ফিরে যাচ্ছে। সরু রাস্তার দুপাশে মেলার দোকান-পাট বসেছে। আর কত দুর যেতে হবে জিজ্ঞেস করতে করতে যাচ্ছি। অবশেষে প্রবেশদ্বার দেখা গেল। এখানে ভিড অনেক পাতলা হয়ে এসেছে, সামনে মাঠে উৎসবের জন্য বাঁধা প্যান্ডেল এখন খোলা হচ্ছে। ইতঃস্তত ঘুরে ভাবলাম, কাউকে জিজ্ঞেস করি কোন দিক দিয়ে দেখা আরম্ভ করলে সুবিধা হবে। একজন বললেন বাঁদিক দিয়ে দেখলে সুবিধা হবে। মাঝখানে রাস্তা, তার উল্টো দিকে অর্থাৎ ডানদিকে উপাসনালয় ও আরো কিছু দ্রষ্টব্য আছে। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটি সুবেশা মেয়ে এগিয়ে এল। বলল, চলুন আমি ও আমার এই বন্ধু আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, আমরা সেই রকমই নির্দেশ পেয়েছি। প্রথমে দেখলাম উপগুপ্ত মহাথেরার মন্দির। তারপর সুউচ্চ প্যাগোডা স্থাপত্যের আকারে নির্মিত স্বর্গগৃহ। ভিতরে বুদ্ধমূর্তি আছে। সম্পূর্ণ মন্দিরটি রূপালি। তাতে সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল শোভা ধারণ করেছে। ভিক্ষুদের বাসগৃহ আছে, আর আছে পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাথেরা, যিনি বনভন্তে নামে পরিচিত, তাঁর প্রতিকৃতি ও তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। প্রধান উপাসনালয় বার্মিজ স্থাপত্যে তৈরি। ডান দিকে দেশনালয়, ধর্মালোচনা ও প্রার্থনা সভাঘর। উপাসনালয়ের ডান দিকে একটি ছোট বাড়ি থাই স্থাপত্যের নিদর্শন। ১৯৭৪ সালে চাকমা রাজবংশের রাজমাতা আরতী রায় ও তার ছেলে ব্যারিস্টার দেবাশিষ রায়ের তত্ত্বাবধানে বনভন্তেকে রাঙামাটিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলকামনায়। বনভন্তে রাঙামাটিতে এসে থাকতে রাজি হন এবং ১৯৭৭ সালে রাঙামাটিতে তার বাসস্থান পুরোপুরি স্থানান্তরিত করেন। তখন স্থানীয় লোকজনেরা বনভন্তে এবং তার শিষ্যদের জন্য একটি বিহার স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন। বর্তমান রাজবন বিহার ১৯৭৪ সাল থেকে তারই ক্রুমোন্নতির ফল। একটু দূরে আরেকটির নির্মাণ কাজ হচ্ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি প্রশস্ত চতুর। মেয়ে দুটি এবার বিদায় চাইল। উজ্জ্বল রূপালি প্যাগোডার পাশে তাদের ফটো তুলেছিলাম। কিন্তু তখনই দেখাতে পারিনি। তাদের অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে, পাশের রাস্তায় একটি ফাঁকা অটো পেয়ে,

বড় রাস্তায় চলে এলাম। শুনেছিলাম, রাঙামাটিতে উপজাতি সংস্কৃতির জাদুঘর আছে। একজন অটোচালককে বলতে সেনিয়ে যেতে রাজি হলো। বাড়িটা পুরনো আমলের। ভেতরে ঢুকে ডান দিকে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। তার ভেতরে মনে হয় কোন নাটকের মহড়া হচ্ছে। সেখান থেকে একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, উপজাতি সংস্কৃতির জাদুঘর কোনটি। ভদ্রলোক সামনের পুরনো বাড়িটি দেখালেন, বললেন, বোধহয় বন্ধ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি যদি দেখানো যায়। খানিক বাদে ঘুরে এসে জানালেন, আজকে দেখানোর অসুবিধে আছে। আমি বাইরে থেকে কয়েকটা ছবি তুলে ফিরে চললাম। বাইরে থেয়ে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম।

আগামীকাল যাব চটেশ্বরী মন্দির। আঠারো'শ শতাব্দীতে চটেশ্বরী মন্দির নির্মিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনির আক্রমণে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পূর্ববর্তী মূর্তিটি নিমকাঠের ছিল, কৃষ্ণবর্ণ। যুদ্ধ চলাকালীন তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা চক্রবর্তী বংশের সদস্যরা কেবলমাত্র মূর্তির উর্ধ্বাঙ্গ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধ শেষে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে বাস, তারপর রিকশা নিয়ে মন্দিরে পৌঁছালাম। তখন নিত্য পূজার আয়োজন চলছে। পুরোহিত পুজোয় বসেছেন। সামনে বেশ বড় আচ্ছাদিত বাঁধানো প্রাঙ্গণ, নাটমন্দির। উৎসবে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় কয়েকজন মহিলা পুজোর দালানে বসে আছেন। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, মন্দিরটি কত প্রাচীন। তিনি বললেন, কত প্রাচীন তা বলতে পারব না। মন্দিরের সংস্কার হয় মুক্তিযুদ্ধের পর। তিনি বললেন, যাঁদের মন্দির, তারা পাশেই থাকেন। আপনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে সব জানতে পারবেন। দুজন মহিলা মন্দিরের দিকে আসছিলেন। তাঁদের বললেন, আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি। এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁর বয়স হয়েছে। কিন্তু অতটা বৃদ্ধ বলে মনে হয় না। বললেন, ব্রিটিশ আমলে মন্দিরের মূর্তি নিমকাঠের তৈরি, কৃষ্ণবর্ণ, আড়াই-তিন ফুট ছিল। মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে মূর্তিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূর্তিটি এখন কাঁচের বাক্সে রাখা আছে। বললাম, একবার দেখানো যাবে? বললেন, হ্যাঁ। তারপর মন্দিরের ঘরে ঢুকে কাঁচের বাক্স থেকে বের করে হাতে নিয়ে আমাকে দেখালেন। লাল পাড়, সাদা কাপড়ে জড়ানো। অনুমতি নিয়ে বিগ্রহের একটি ফটো নিলাম।



মন্দিরের পাশে একটি পুকুর আছে। উনি জানালেন ব্রিটিশ রাজত্বকালে বিপ্লবীরা ওখানে বসে গোপনে ভবিষ্যৎ কাজকর্মের পরিকল্পনা করতেন। তাই ইংরেজ সরকারের ওঁদের বাড়ির দিকে নজর ছিল। পরিবারের সকলে বাড়ি ছেড়ে দেশের ঘরে চলে গোলেও ওনার জ্যাঠামশাই কিছুতেই যেতে চাননি। ভদ্রলোকও তখন চট্টগ্রামে ছিলেন। মন্দির থেকে ফেরার সময় মিষ্টি প্রসাদ খেয়ে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, এঁরা কত কিছু ঘটনার সাক্ষী থেকে গেছেন। ফেরার পথে অলংকার বাসস্ট্যান্ডের কিছু আগে সৌদিয়া বাস কোম্পানির টিকিট কাউন্টার থেকে কক্সবাজার যাওয়ার টিকিট কাটলাম। আগামীকাল সকাল এগারটায় বাস ছাড়বে। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ১৫২ কিমি। ফিরে এসে আশ্রমের অফিসঘরে গিয়ে সেই রাতে খাওয়ার জন্য কুপন নিলাম আর আশ্রমের জন্য কিছু দান করলাম। আগামীকাল সকালে চলে যাব জানিয়ে এলাম। সকালবেলায় অফিস ঘরে চাবি জমা দিয়ে রওনা দিলাম কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে।

যথাসময়ে বাস ছাড়ল। কক্সবাজার পৌঁছতে পোঁছতে বিকেল হয়ে গেল। বাসস্ট্যান্ডে নেমে হোটেলে যাওয়ার জন্য একটা রিকশা ভাড়া করলাম। ডলফিন মোড়ে সুগন্ধা বিচ-এর কাছে একটা হোটেলে উঠলাম। তখন পড়ন্ত বিকেল। জিনিসপত্র ঘরে রেখে হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। একটা অটো ডেকে সুগন্ধা বিচ-এর মোড়ে নামলাম। খুব কাছেই। সেখান থেকে থেকে খানিক হেঁটে গেলেই সুগন্ধা বিচ। দু'ধারে অসংখ্য দোকান। নানা রকম জিনিস বিক্রি হচ্ছে। তখন ভাটার টান, তাই সমুদ্র অনেক দূরে চলে গেছে। সেই দূরে জলের কাছাকাছি মানুষগুলোকে খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত ১২০ কিমি লম্বা। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সামনের সৈকতে ছাতার নিচে কাঠের চেয়ার পাতা, সবকটাই ভর্তি। বসার জায়গা নেই। টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হলো। আমি ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলাম। যেতে যেতে দেখলাম দোকানগুলোয় আলো ঝলমল করছে। হোটেলে ঢোকার আগে ভাত ডাল সবজি খেয়ে নিলাম। কেক বিস্কুট কিনে ঘরে ঢুকে গোলাম। আগামীকাল মহিষখালি দ্বীপে যাব।

সকাল সকাল উঠে একটা রিকশা নিয়ে জেটিঘাটে পৌছালাম। জেটিতে ঢোকার মুখে পাঁচ টাকার টিকিট কাটতে হয়। ঘাটে পৌছে দেখি একটা ট্রলার ছাডছে। ট্রলারে গেলে তিরিশ টাকা ভাড়া আর স্পিড বোটে গেলে পঁচাতর টাকা। ট্রলারটায় উঠে পড়লাম। বেশি লোক ছিল না তাই চারিধারে সমুদ্রের দৃশ্য বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করতে পেরেছি। ট্রলার মহিষখালি দ্বীপের জেটিতে লাগতে ঘাটে উঠে কাঠের পাটাতন পাতা ব্রিজ দিয়ে পিচ বাঁধানো রাস্তায় গিয়ে দেখি রাস্তার দু'ধারে সারি দিয়ে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশা চালকেরা ছেঁকে ধরল। সবাই একজনের রিকশায় উঠতে বলছে। দেখলাম ছেলেটি বোবা তাই সে খন্দের ধরতে পারে না, অন্যেরা সুযোগ দিলে তবে তার রোজগার হয়। দরদস্তুর করে তার রিকশাতেই উঠলাম। খুব খুশি। প্রথমে গেলাম এক বুদ্ধমন্দির, দেখেই বোঝা গেল মন্দিরটি খুব প্রাচীন। লিপিগুলি দেখে চিনতে পারলাম না। সামনে একটা গোলাকার ছাউনি দেওয়া বিশ্রামের জায়গা। সেখানে কয়েকজন বসে আছেন। ওখানেই জুতো খুলে রেখেছিলাম। সেখানে গিয়ে বেঞ্চে বসে জিজেস করলাম, ফলকের লেখাগুলো কি ভাষায় লেখা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাঁরা বললেন আরাকান ভাষায়। ওঁরা আরাকান থেকে এসে এখানে বহুদিন ধরে বসবাস করছেন। এখানকার বুদ্ধমূর্তি অতিশয় প্রাচীন। রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মন্দির আনুমানিক ২৮৩ বছরের পুরনো। ২০০৪ সালে মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ হয়। দ্বীপের এই চতুরে প্রচুর বুদ্ধমূর্তি ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট, শায়িত, দণ্ডায়মান প্রভৃতি বিভিন্ন মুদ্রায়। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্যাগোডা ও জলাশয়ে পদ্মের উপর উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। এরপর গেলাম আদিনাথ মন্দির দর্শন করতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি পাশের ঝোপ থেকে খুব কিচকিচ শব্দ হচ্ছে, দেখি এক ভদ্রলোক ফটো তোলার চেষ্টা করছেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কার ফটো তুলছেন? বললেন, "সাপের। সাপটা শব্দ করে ডাকছে।" দেখলাম সত্যিই একটা সরু লিকলিকে সাপের মুখ, শব্দ করে ডাকছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি সামনে বিশাল চতুর। সেই চতুরে নেমে একধারের দেওয়াল জুড়ে প্রস্তর ফলকে আদিনাথের কাহিনি, মন্দিরের ইতিহাস ও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে মন্দিরে আদিনাথ শিবলিঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য নানান দেবমূর্তি আছে। আদিনাথ মন্দির মৈনাক পাহাডের চূডায় অবস্থিত। শিবকে এখানে আদিনাথ নামে পজো করা হয়। স্থানীয় লোককাহিনি অনযায়ী এই মন্দির তিন হাজার বছর আগে শিবের আরাধনা স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিনাথ মন্দির দর্শন করে একটা কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে একেবারে সমদ্র, পাহাড ও বনের সম্মিলিত দৃশ্যপটে এসে পড়লাম। ভারী চমৎকার দৃশ্য। একেবারে ছবির মত। এখানে নাকি শুটিং হয়। রিকশাচালক ছেলেটি ইশারায় নানা জায়গার ছবি তুলতে বলল। কয়েকটা তুললাম। এবার জেটিতে ফিরে যাওয়া। রিকশাচালকের টাকা মিটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি ছেলেটা পিছু পিছু আসছে। রিকশাটা বোধহয় কারোর জিম্মায় রেখে। এবার একটা স্পিডবোটে উঠলাম। ছেলেটাও উঠল। আমি জায়গা করে বসলাম, তখন ছেলেটা নমস্কার করে চলে গেল। স্পিডবোট থেকে নামার সময় এক বিপত্তি হল। স্পিডবোট পাশাপাশি খালি বোটে ভেড়ে। লোকেরা তাতে লাফিয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে ওঠে। ট্রলার উঁচু বলে সরাসরি জেটিতে ভেড়ে। আমিও একটা পা পাশের স্পিডবোটে রেখেছি, আরেকটা পা তুলতে গিয়ে বোটের খাঁজে আটকে গেল। একটা হাত একজন ধরেছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাব, অন্য একজন খপ করে আরেকটা হাত ধরে ফেলল। আরেকজন খাঁজ থেকে পাটা ছাড়িয়ে দিল। দৃশ্যটা বোধহয় বেশ মজার হয়েছিল, দেখলাম অনেকে হাসছে। অন্য বোটে পা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে জেটিতে উঠে গেলাম। বেঞে কিছুক্ষণ বসে আবার জেটি পারের টাকা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রিকশা করে হোটেলে পৌঁছে ভাত খেয়ে ঘরে ঢুকলাম।

এর পরদিন রামু যাব। রামকোট বিহার। সিএনজি করে বাস টার্মিনালে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করাতে একজন রামু যাওয়ার বাস কোথায় দাঁড়ায় দেখিয়ে দিলেন। বাস রামুর বড় রাস্তায় নামিয়ে দিল। ডান দিকের রাস্তা দিয়ে চৌমহানি। সেখান থেকে অটোয় চেপে বৌদ্ধ বিহার। সুপ্রাচীন বিহার। তবে সংস্কারের ফলে আধুনিকত্বের ছাপ পড়েছে। এর আগেও আসার পথে আরও বৌদ্ধমঠ আছে। শুনলাম প্রায় ১০০ ফিটেরও বেশি উঁচু বুদ্ধমূর্তি দর্শন করা যায়। তবে আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অটো রামকোট-এর গেটের সামনে নামিয়ে দিল। কিছু দূর হেঁটে সিঁড়িতে ওঠার মুখ থেকে একেবারে উপর পর্যন্ত বাঁদিকে সারি প্যানমগ্ন বোধিসত্ব মূর্তি আছে। শেষে একটি প্রাচীন বটগাছ, চৌদ্দশো বছর আগে বসানো হয়েছিল। গাছের নিচে সম্রাট অশোকের বিশাল মূর্তি। উনি এখানে এসেছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় দেওয়ালে প্রস্তর ফলকে মন্দিরের ইতিহাস ও প্রাতাত্তিক তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।



রামু এলাকাটি আরাকানের এক প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিল। প্রথম রাখাইন রাজ চেন্দা থুরিয়ার শাসনকালে (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮০ থেকে ৫২৮) তাঁর আমন্ত্রণে সেবক আনন্দকে নিয়ে তথাগত গৌতম বুদ্ধ আরাকানে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এখানে এক ধর্ম সম্মেলনে তিনি সেবক আনন্দকে বলেন, ভবিষ্যতে পশ্চিম সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে পাহাড়ের ওপর আমার বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে। তখন এর নাম হবে রাং-উ। রাং-উ রাখাইন শব্দের অর্থ বক্ষাস্থি। রামু শব্দের সঙ্গে রাং-উ শব্দের মিল আছে। মৌর্য বংশের তৃতীয় সম্রাট, অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২) কর্তৃক স্থাপিত চুরাশি হাজার ধাতু চৈত্যের মধ্যে রামুর চৈত্যটি অন্যতম। রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারের মঠাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করায় জানালেন, বুদ্ধদেবের পিঞ্জরাস্থির একটি টুকরো মঠের মূর্তিতে রাখা আছে। নমস্কার জানিয়ে ফিরে আসছি, সিঁড়িতে এক ভিক্ষু দাঁড়িয়েছিলেন। উনি কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করলেন আর দ্বিপ্রাহরিক প্রসাদ গ্রহণ অর্থাৎ আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে বিদায় নিলাম।

বৌদ্ধ বিহারের ঠিক পাশেই প্রাচীন হিন্দু তীর্থস্থান শ্রীশ্রী রামকোট তীর্থধাম। রামকোট বনাশ্রমের পাশে অপর একটি পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেও সিঁড়ি ভেঙে ওপরে মন্দির। কারো কারো মতে এটি সতেরো শতকে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত।



রাম ও সীতা বনবাসকালে এখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন বলে সনাতন হিন্দুধর্মীরা বিশ্বাস করেন। মন্দিরের পুরোহিত ও তার পরিবারের সদস্যদের ওখানেই বাসস্থান। বংশপরম্পরায় পুজো করে আসছেন। একটি ছোট ছেলে পাশের বেল গাছে উঠে পুজোর জন্য বেলপাতা পাডছিল। গাছ থেকে নেমে বলল, এখান থেকেই রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায়। সে যাই হোক ভ্রমণে প্রচলিত লোককাহিনি একটা আলাদা মাত্রা সংযোজন করে। মন্দিরচতুরের ভেতর একটা বুদ্ধমন্দির রয়েছে। খুবই পুরনো। একটি প্রাচীন দুর্গা মন্দিরও রয়েছে। বড় মন্দির ও তৎসংলগ্ন মণ্ডপটি সংস্কার করা হয়েছে। বড় মন্দিরে রাম সীতার মূর্তি, শিবলিঙ্গ, নারায়ণ মূর্তি ও গোপালের মূর্তি আছে। দুর্গাপুজো ছাড়াও বাসম্ভী পুজো ও ফাল্যনে শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রচুর লোক সমাগম হয়। মন্দির চতুরের পাশে অতিথিশালা আছে। উৎসব উপলক্ষে অতিথি সমাগম হয়। পূজারী বংশের এক ভাইয়ের স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলেন। মন্দির চতুর থেকে বেরিয়ে একধারে কতগুলি স্তুপ দেখিয়ে ওগুলো কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি জানালেন, বংশপরম্পরায় পরিবারের কোন সদস্য মারা গেলে, তার মৃতদেহ তাদেরই জমিতে দাহ করে, চিতা ভস্ম নিয়ে, এই সমাধি ক্ষেত্রের নির্মাণ করা হয়েছে। ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসছি, সিঁডির নিচে রাস্তায় দুজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাতে কিছু শাকপাতা। কাছে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসছি। বললাম কলকাতা। বললেন আমরা ঠিকই আন্দাজ করেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওগুলো কি শাক? বললেন কচুশাক, বাড়ি গিয়ে রাম্না করবো। হেসে বললেন, অনেকে তীর্থ দর্শন করতে আসেন, আপনাকে একলা দেখে আলাপ করতে ইচ্ছে হলো। সিএনজি ধরে আবার চৌমহানিতে ফিরে এলাম। একটা দোকানে মিষ্টি আর কেক খেয়ে বাস ধরে, বাসস্ট্যান্ডে নেমে, রিকশা নিয়ে ডলফিন মোড়ে ফিরে এলাম। তখন বিকেল। ভাবলাম শুধু সুগন্ধা সৈকত দেখা হয়েছে, কাছাকাছি আরো একটা সৈকত আছে কুলতলী আর একটু দুরে হিমছড়ি। অটোর লাইনে একজন অটোচালককে বললাম, হিমছড়ি যাব। তিনি বললেন, যদি একটু দাঁড়ান তবে প্যাসেঞ্জার হলে নিয়ে যাব। চল্লিশ টাকা লাগবে। কিছুক্ষণ বাদে অটো ছাড়লো। হিমছড়ি কক্সবাজারের ৩২ কিমি দক্ষিণে। সৈকতের বেশিরভাগটাই সিমেন্টের জমাট পাথর। সমুদ্রের জল বারবার ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অটো সৈকতের কাছে নামিয়ে দিল। সৈকতের সামনে রেস্তোরাঁ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সমুদ্রমুখী বারান্দায় অনেকে বসে আছে। কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়া করছে। অপ্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সমদ্রের জলে জমাট পাথরে দাঁড়িয়ে ফটো তুলছে। বারান্দায় বসে সমুদ্রকে খুব ভালোভাবে দেখা যায়। পাকা রাস্তা সমুদ্রতল থেকে অনেকটাই উঁচুতে। রাস্তার পেছনদিকে খানিক হেঁটে কয়েকটা দোকান। সেখানে সৌখিন জিনিস বিক্রি হচ্ছে। আরো কিছুটা হাঁটলে একটা ঝরনা। ঝরনার পাশ দিয়ে গেলে পাহাড়। রেলিং দেওয়া সিঁড়ি আছে। মাথায় উঠে চারিধার দেখা যায়। আমি ঝরনার ফটো তলে রেস্তোঁরায় ফিরে এলাম। শান্ত নির্জন এলাকা। বেশি ভিড নেই। এবার ফেরার পালা। একা গেলে অটো ভাডা অনেক বেশি। একজন অটোচালক বললেন, আপনি উঠে বসন, সওয়ারি হয়ে যাবে। সতিটে তাই। এক অল্পবয়সী দম্পতি কিছ দুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। খানিক বাদে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি অটোটা ভাড়া করেছি কিনা। বললাম, আপনারা বসতে পারেন। ওঁদের সদ্য বিয়ে হয়েছে। দুদিনের ছুটিতে সমুদ্র দর্শন করতে এসেছেন। ঢাকায় থাকেন। আমার হোটেল এসে গেল। আমি ভাড়া মেটাতে গেলে কিছুতেই দিতে দিলেন না। বললেন, আলাপ করে খুব ভালো লাগলো। হোটেলে ভাত খেয়ে একটা পরিবহন সংস্থায় গেলাম আগামীকাল ঢাকা যাওয়ার টিকিট সংরক্ষণের জন্য। সকাল দশটায় বাসে টিকিট পেলাম।

পরদিন সকাল দশটায় পৌঁছে শুনলাম বাসে কিছু গন্ডগোল থাকায় এগারোটা নাগাদ অন্য বাসে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাই হোক, এগারোটায় বাস ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। পথে অনেকেই নেমে গেলেন। বাসে তখন অল্প সংখ্যক যাত্রী ছিলেন। ড্রাইভার বললেন বাস আর যাবে না। সকলে হৈ হৈ করে উঠলেন। গন্তব্যে পৌঁছে দিতেই হবে। তখন আটটা বেজে গেছে। তখন ওই পরিবহন সংস্থাকে ফোন করে একটা ছোট বাসের ব্যবস্থা করা হলো। বাস এলে যারা বসেছিলাম, সবাই ছোট বাসে উঠলাম। কন্ডান্টরকে বললাম, আমাকে একটা আবাসিক হোটেলের কাছাকাছি নামিয়ে দেবেন। তিনি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি নামিয়ে দিলেন। একটা রিকশার লাগেজ তুলে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি একটা হোটেল। রিকশাতে উঠে হোটেলের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে হোটেলে ঢুকতে যাবো, একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, রুম দরকার? আমি হ্যাঁ বলতে সে আমার লাগেজ নিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। রিকশাচালককে দশ টাকা দিয়ে আমি ওপরে উঠে গোলাম। আবাসিক হোটেলের নিচেই খাওয়ার হোটেল। জলখাবার থেকে দুপুরের ও রাত্রের খাবার পাওয়া যায়। আমি নিচে নেমে এলাম। ঘডিতে দেখলাম দশটা বেজে গেছে। রাত্রে সেখানেই খেলাম।

প্রদিন সকালে নিচের হোটেলে প্রোটা তরকারি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর হেঁটে একটা দোকানে দেখলাম দুই ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, ঢাকেশ্বরী মন্দির এখান থেকে কত দূর? একজন উত্তর দিলেন বেশ দূর আছে। আপনি আগে রামকৃষ্ণ মিশন ঘুরে আসুন। কাছেই। তারপর ওখান থেকে রিকশা নিয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যাবেন। ধন্যবাদ জানিয়ে একটা রিকশা নিয়ে রামক্ষ্ণ মিশন গেলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শান্ত পরিবেশ। দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিষেবা আছে। তবে সামনে কিছু নির্মাণ কাজ চলছে বলে একটু অগোছালো লাগলো। প্রার্থনাগৃহে ঢুকে খানিকক্ষণ বসলাম। দু'চারজন বসে আছেন। তখন হয়তো পূজাপাঠের সময় নয় তাই মহারাজ বা ব্রহ্মচারীদের নজরে পড়লো না। তাঁরা নানা সেবামূলক কাজ করেন, হয়তো তাতে ব্যাপত আছেন। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে রিকশাচালককে বললাম প্রথমে ঢাকেশ্বরী মন্দির, তারপর লালবাগ দর্গ দেখিয়ে আবার রামকফ্ষ মিশনের কাছে নামিয়ে দেবে। রাজি হলো। রিকশায় উঠে দেখি সে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের রাস্তা ঠিক ভাবে চেনে না। অন্য রিকশাচালককে জিজ্ঞাসা করতে করতে যাচ্ছে। ফলে অনেক ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে। অবশেষে ঢাকেশ্বরী মন্দির এলো। মন্দিরের প্রবেশঘারের কাছেই জুতো খুলে রাখার সুবন্দোবস্ত আছে। জুতো খুলে রেখে মূল মন্দিরে গেলাম। মূল মন্দিরটি তিনটি কক্ষে বিভক্ত। মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সমভিব্যাহারে সিংহবাহিনী মহিষাসরমর্দিনী মর্তি। দেড ফিট উঁচ। আসল মূর্তিটি ভারত বিভাজনের সময় উদ্বাস্ত্রদের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মূর্তিটি আসল মূর্তির প্রতিরূপ। ডান ও বাম দিকের কক্ষে অন্য মূর্তি পূজিত হয়। ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে জাতীয় মন্দির বলা হয়। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকেশ্বরী থেকে ঢাকা শহরের নামকরণ হয়েছে বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের ফলে এই মন্দিরের বর্তমান স্থাপত্যকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের

দুর্গোৎসব বাংলাদেশে অন্যতম দুর্গোৎসব। এই উপলক্ষে বিজয়া সিমালনী ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এ ছাড়াও জন্মাষ্টমী ও অন্যান্য উৎসব পালিত হয়। মূল মন্দিরের সামনে নাটমন্দির আছে। মন্দিরের পেছনে বামদিকে চারটি শিব মন্দির আছে। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহ মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন ও চারটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তবে তথ্যটি প্রামাণ্য নয়। মন্দির প্রাঙ্গণের আয়তন বেশ বড়। মন্দির থেকে বের হওয়ার মুখে দেখি রিকশাচালক দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওর লালবাগ দুর্গ নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আর যেতে রাজি হলো না। অগত্যা টাকা মিটিয়ে দিয়ে অন্য রিকশা নিলাম। লালবাগ দুর্গ খুব কাছেই। তবে শহরের মধ্যে দুর্গের অবস্থান বলে চারপাশে অউালিকার মধ্যে এই প্রাচীনত্বকে মানিয়ে নিতে হয়। টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম।



রমণীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে পথ। দুর্গের তিনটি দ্বার। তার মধ্যে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মুহামাদ আজম এই দুর্গের কাজ শুরু করেন। পরে পরবর্তী শাসনকর্তা হিসাবে শায়েস্তা খাঁ এসে নির্মাণ কাজে হাত দিলেও তা শেষ করতে পারেননি। তাঁর মেয়ে পরীবিবি ১৬৮৪ সালে মারা যান। শায়েস্তা খাঁ দুর্গটির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রাখেন। বিশালায়তন জমির মধ্যে অবস্থিত দুর্গটির স্থাপত্য প্রধানত তিনটি। একটি মসজিদ, অপরটি পরীবিবির সমাধি, আরেকটি দেওয়ান-ই-আম বা সুরম্য দ্বিতল দরবারকক্ষ ও হামামখানা।



এটা আগে গভর্নরের বাসগৃহ ছিল। বর্তমানে একতলাটি মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন অন্ত্রশস্ত্র, ব্যবহৃত জিনিস, পরিচ্ছদ, মুদ্রা প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। দ্বিতলে ওঠার দরজাটি বন্ধ ছিল। পরীবিবির সমাধিটি সম্পূর্ণ পাথরের তৈরি। বাইরে থেকে ভেতরের কক্ষ উন্মুক্ত গরাদ দেওয়া দরজা থেকে দেখা গেলেও ধূলিধূসরিত ছিল। তবে সৌধটির স্থাপত্য চমৎকার। সৌধের সোজাসুজি জল সংরক্ষণের আঠারোটি কক্ষবিশিষ্ট বাড়ি পর্যন্ত বাঁধানো জলাধার, তবে বর্তমানে শুক্ত। তাতে নির্দিষ্ট দূরত্বে ফোয়ারা ছিল। জল সংরক্ষণের গৃহটির ওপরের ছাদে পর্যটকরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখলাম। গৃহটি থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। পয়ঃপ্রণালীরও সুবন্দোবস্ত ছিল। মসজিদটি বর্তমানে রেলিং দিয়ে ঘিরে দুর্গ থেকে আলাদা করা হয়েছে যাতে জনসাধারণ ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদে যেতে পারেন। কোন টিকিটের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের বর্তমান খননকার্যের ফলে অন্যান্য নির্মাণকাজ আবিক্ষৃত হয়েছে। এর থেকে দুর্গটির একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। দুর্গটির চতুর্দিকে দৃষ্টিনন্দন উদ্যান অতীব চিত্তাকর্ষক। দুর্গ থেকে বেরিয়ে রিকশা করে হোটেলের পথ ধবলাম।

পরদিন সকালে উঠে আগে মতিঝিল যাব, সেখানে সোনালি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়। ওখানে সরাসরি ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশি মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রা বিনিময়ের পর জাদুঘর যাব ঠিক করলাম। জাদুঘরের টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে দেখলাম এক তলা থেকে চার তলা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের নানা নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রাচীন না হলেও সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ভাবে সাজানোর ফলে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একটি তিমি মাছের কঙ্কাল গোটা হল জুড়ে রয়েছে। বাংলাদেশে সমুদ্রতট থেকে পাওয়া গিয়েছিল। আরেকটি হল জুড়ে একটি নৌকা। এছাড়া বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, পুঁথির সংগ্রহ, দেওয়াল জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীর ছবি রয়েছে। কোন কোন ঘটনা আবার দেখানোও হচ্ছে। বিভিন্ন তলে বিভিন্ন সামগ্রী বিভাগ অনুযায়ী সাজানো আছে। জাদুঘরে একটি গ্রন্থাগারও আছে। সেখানে কিছু সময় কাটালাম। প্রতি তলায় প্রদর্শক ও রক্ষীরা আমাকে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নিতে বলছিলেন। সুন্দরবন বিভাগটিও বেশ ভালো লেগেছিল। এর আগে কিছু জাদুঘর দেখেছিলাম বলে অনেক দেবদেবীর মূর্তি আগেই দেখা হয়েছিল। সুতরাং ঢাকায় জাদুঘরে দেবদেবীর মূর্তিগুলি অনেকটাই পরিচিত ছিল। মূর্তিগুলি প্রাপ্তিস্থান সময়কাল লেখা থাকায় কিছু নতুন মূর্তিও দেখা হয়ে গেল। অবশেষে জাদুঘর দেখা সাঙ্গ করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন খুব সকালে উঠে রমনার মাঠ দেখতে বের হলাম। অনেকে প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়েছেন, কেউ কেউ শরীরচর্চা করছেন। গেটের বাইরে দুধ পাউরুটি নানা ধরনের পিঠে, ফল বিক্রি হচ্ছে। এবার নজরুলের সমাধিক্ষেত্র দর্শনে চললাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের রাস্তা দিয়ে নজরুলের সমাধি ক্ষেত্রে পৌছালাম। শান্ত নির্জন স্থান। নজরুলের সমাধির পাশেই জয়নুল আবেদীন সহ কিছু শহীদের সমাধি রয়েছে। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকেছিলাম। দূর থেকে একটি ভাস্কর্যও নজরে পড়েছিল। সেই বিশাল চত্বর ঘুরে দেখা হয়নি। আগামীকাল বাংলাদেশে আমার শেষ দিন। ভ্রমণ কর জমা দিতে হবে। কমলাপুর স্টেশনে ভ্রমণ কর জমা দিয়ে জানলাম মৈত্রী এক্সপ্রেস ছাড়বে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে। কমলাপুর স্টেশন থেকে বেশ দূরে। ভ্রমণ কর জমা দেওয়ার পর চললাম ঢাকার নিউমার্কেট। প্রচুর দোকানপাট। এ গলি থেকে সে গলি কিছুক্ষণ ঘুরে, সামান্য কিছু কেনাকাটা করে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরেরদিন সকাল ছয়টাতেই রিসেপসন কাউন্টারে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিলাম। উনি বললেন, আবার আসলে আমার হোটেলেই উঠবেন। রিসেপশন কাউন্টারের ছেলেটি আমার জিনিসপত্র অটোতে তুলে দিল। আমি বাংলাদেশকে বিদায় জানিয়ে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লো। পথে যেতে যেতে যমুনা দর্শন হল। অবশেষে কলকাতা স্টেশন। বাংলাদেশের আন্তরিকতা সাতি হয়ে রইল।



বাহাত্তর বছরের নীলিমা ঘোষ ঘরের কাজের থেকে সময় করে মাঝেমাঝেই বেরিয়ে পড়েন পথে। তাঁর আগ্রহ ভ্রমণস্থানটির প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি।



~ ~ ~ ~ ~ ~

মত দিয়েছেন :

কেমন লাগল : - select - 🗸

select - Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন



= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

শিবখোলা আর লাটপাঞ্চারে

অরুণাচল চ্যাটার্জি

ভোরের দিকে বেশ কিছু পাখির ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল, এ অঞ্চলে আগে আসিনি, তাই ডাক শুনে চট করে চেনাও মুশকিল সেটা কোন পাখির। ময়রের ডাক-ই যা চিনতে পারছি। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছি, সবাই মিলে যে এইসময় বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম, সেটা কি ঠিক করেছি? বিশ্বজোড়া 'গেল গেল' রব, তার মধ্যে আমাদের ছোট কন্যাসহ বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দোলের ছটিতে, বেশি দূর না, শিলিগুড়ি থেকে খুব কাছেই, শিবখোলা আর লাটপাঞ্চার।

নানা রকম চিন্তাভাবনা যখন মস্তিস্কটাকে পেঁচিয়ে ধরছে, শরীরের সমগ্র শক্তি দিয়ে তাদের ছিটকে ফেলে টপাং করে একলাফে বিছানার বাইরে বেরিয়ে এলাম। খব ঠাণ্ডা না থাকলেও একটা জ্যাকেট তো জড়াতেই হয়। বাইরে রোদ তখনও ওঠেনি। বেশ কয়েকটি কটেজ একসারিতে, খোলার (পড়ুন শিবখোলা, মানে ছোট্ট নদী) ছড়ানো উপত্যকার একপাশে রয়েছে। উপত্যকার একদিকে খাড়া পাহাড় আর অন্যপাশটা ধাপে ধাপে ওপরে উঠে রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। তাই এই বাটির মতো অংশে রোদ এসে পোঁছাতে একটু দেরি হবে। কটেজগুলোর সামনের অংশে কিছু লম্বা গাছপালা রয়েছে, তবে মাদার গাছের আধিক্যই বেশি চোখে পড়ে। পাতাহীন মাদার-এর শাখা-প্রশাখাগুলির শেষপ্রান্ত গুচ্ছগুচ্ছ ফুলে ভর্তি, টকটকে লাল রঙের। ফুলের মধু খেতে পাখিদের আনাগোনাও দেখার মতন। মাদার গাছগুলো পেরিয়েই, শিবখোলা বয়ে চলেছে আমাদের বামদিক থেকে ডানদিকে। এসময় বেশি জল নেই, কোথাও হাঁটু জল তো কোথাও গোড়ালি-ডোবা জল। খুব সরু একটা বাঁশের সাঁকো করা রয়েছে, জল বাড়লে অথবা কেউ যদি পা না ভিজিয়ে পারাপার করতে চায়, তাহলে এরই শরণাপন্ন হতে হবে। জলধারার মধ্যে মধ্যে বড় বড় বোল্ডার। মূল রাস্তা থেকে অনেকটা নেমে এসে নদী পেরিয়ে তবে এই ক্যাম্পে আসা। অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে থাকা-খাওয়াবাবদ দৈনিক ১২০০ টাকা জনপ্রতি। মেনু নির্দিষ্ট থাকে। থাকার জায়গাটা অনেকটা আটচালার মধ্যে টেন্ট খাটানো। প্রসাধনের ব্যবস্থা বেশ ভালোই।







খোলার পাশে গিয়ে একটা বোল্ডারে বসলাম। কত অজানা পাখির বাস এই অঞ্চলে। চুপচাপ বসে ওদের 'কথা' শুনছি। স্বচ্ছ জলের তলার নুড়িগুলো বেশ দেখা যায়। আমাদের মেয়ে গতকাল পৌঁছেই এই নুড়ি নিয়ে মেতে ছিল। অবশ্য আমরাও তো কম যাইনা এব্যাপারে। সামনের বড় বোল্ডারে একটা হোয়াইট-কেপড রেডস্টার্ট (white-capped redstart) এসে বসলো। কাল বিকেলে একজোড়া প্লামবিয়াস ওয়াটার রেডস্টার্ট-ও (plumbeous water redstart) দেখেছিলাম। বন্ধুদের সৌজন্যে অনেকগুলো পাখি দেখা হল এসে থেকে।



গতকাল এন.জে.পি. স্টেশন থেকে বেরিয়ে, শিবখোলা থেকে পাঠানো গাড়িতে রওনা হয়েছিলাম। পথে রংটং-এ একবার জল-খাবারের জন্য দাঁড়ানো হল। প্রায় এগারোটা নাগাদ পৌঁছেছিলাম শিবখোলায়। তারপর থেকে যেন কান-এর শান্তি। পাখির আর পোকার ডাক ছাড়া কোনো কোলাহল নেই। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম। দুপুরে খাওয়ার পর নালা ধরে একটু আধটু এগিয়েছিলাম আমরা, তা শম্বুকগতিতেই, কোনও তাড়া নেই, গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনও উদ্দেশ্য নেই। নালার একটা অংশে জমা জলে অনেক ব্যাঙাচি দেখলাম। কন্যা তো তাই দেখে মেতে রইল। প্রকৃতিপাঠের জন্য উপযুক্ত জায়গা বটে।

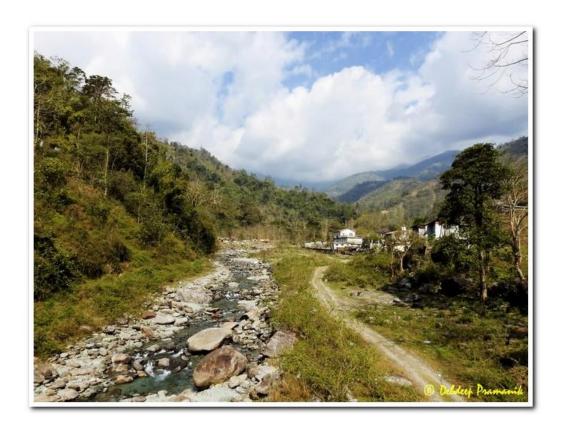
তবে ঝোরায় কিছু ভাঙা কাঁচের বোতল দেখে একটু খারাপও লাগল। সারাদিন ভালো করে রোদ ওঠেনি, তাই কেমন একটা মন কেমন করা পরিবেশ। সূর্য না থাকলে তা আমাদের মনে কী যে প্রভাব বিস্তার করে প্রায় সকলেই জানি।



বন্ধুরা মিলে নালার বোল্ডার-এর ওপর বসে জমিয়ে আড্ডা শুরু হল, বিষয়ের তো কোনো অভাব নেই। আমাদের দিনযাপন, পরিবেশ, পেশা, প্রাণী ইত্যাদি কত কী নিয়ে আড্ডা চলল আর তা সে কতক্ষণ বলতে পারবো না। হঠাৎ টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল, অগত্যা ক্যাম্পের ক্যান্টিনের দিকে হাঁটা দিলাম। ভাবছিলাম যদি একটু গরম চা পাওয়া যেত, এই হালকা ঠাণ্ডা, মেঘমাখা পরিবেশে, নেহাত মন্দ হত না। কিন্তু পরিচারিকারা বলল যে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সন্ধ্যের চাপকোড়ার প্রস্তুতিতে এখনও খানিকটা সময় লাগবে, আর তাই আমরাও বৃষ্টি দেখতে দেখতে গল্পে ফিরে গোলাম। সঙ্গে যোগ দিলেন প্রধান বাবু, অর্থাৎ এই ক্যাম্পের দেখভাল করেন যিনি। তাঁর কাছ থেকেই শুনছিলাম মরসুমি পরিবর্তনে এ পরিবেশের কীরকম বদল হয়, তার সঙ্গে কী কী ধরণের পাখি আসে এখানে, কখন তারা বাসা বানায়, এই অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোন কোন অংশে কোন কোন পাখি দেখা যায় এই সব। ওনার উৎসাহের সঙ্গে আমাদের উৎসাহের বিষয়গুলো যারপরনাই মিলে যাচ্ছে দেখেউনি সোৎসাহে আরো জমিয়ে বসলেন আমাদের সঙ্গে। এইসবের মধ্যে এসে গেলো চা আর পকোড়া, উফফ, যাকে বলে সোনায় সোহাগা।



আমাদের, মানে বাঙালিদের, বেড়াতে গিয়েও কিছু জিনিস যেমন পিছু ছাড়ে না, তার অন্যতম হল সন্ধ্যেবেলা মুড়ি-চানাচুর। ক্যাম্পেরই একজনকে কোথায় মুড়ি পাবো জিজ্ঞাসা করায়নিজেই উৎসাহ নিয়ে এনে দেবে বলল। ঝালমুড়ি খেতে খেতে কটেজের বারান্দায় বসে সময় কাটাচ্ছি। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে, সামনের পাহাড়ের পেছন থেকে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে, এ জিনিস পুরোনো হয়না, তাই না! জ্যোৎস্নার আলোয় জঙ্গলের গাছপালাগুলো জলছবির মতো দেখতে লাগছে। সন্ধে থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের সঙ্গে ময়ূরের ডাকও শোনা যাচ্ছিল। জায়গাটার আশেপাশে হেঁটে বেড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে, তবে বাকেট লিম্ট-এ টিক দেওয়ার মতো সে জায়গা নয়। এ জায়গা শুধু ছোট ছোট টিলা, সবুজ জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়, চা-বাগান, মেঠো রাস্তা, সরু ঝোরা, তাতে বয়ে চলা স্বচ্ছ জল, পাহাড়ি পাখি, পোকামাকড় আর পাহাড়ি মানুষের কথা অনুভব করার।



সকালে ঝোরার ধরে বসে বসে সাত-পাঁচ ভাবছি, গতকালের বৃষ্টির পর ঝকঝকে রোদে পুরো উপত্যকা ভরে উঠেছ;হঠাৎ মেয়ের চিৎকার "বাবা জলে পাথর ছুঁড়ব।" আজ আমরা এ জায়গা ছেড়ে অন্য একটি জায়গায় যাব। সেখানে এতো কাছে নদী পাব কিনা জানা নেই, তাই মেয়েকে নিয়ে একসঙ্গে নদীতে অনেক পাথর ছোঁড়া হল। আরো ছোউবন্ধুরা পাশের এলাকাগুলো ঘুরে দেখে এলো, সঙ্গে নিয়ে এল অনেক পাখি দেখার স্মৃতি। জলখাবার সেরে বেরিয়ে পড়লাম আর একটি পাখি দেখার এলাকার দিকে - লাটপাঞ্চার।



সিমরিং গ্রামের কাছে রাস্তায় একবার গাড়ি দাঁড়ালো, ড্রাইভার দাজু বলল এখান থেকে খুব ভালো পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। পাতলা মেঘের স্তরের মধ্যে দিয়ে দৃশ্য উপভোগ করার চেষ্টা করছি, অনেকটা ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখার মতো। তবে এই ভ্যালি ক্লাউড সরে যেতেই আসল রূপ চোখে পড়ল। আবারো বলতে হয়, ওই টিক্ মারার জায়গার থেকেও কিছু কম নয় এই পথচলতি হঠাৎ পাওয়া ভিউ পয়েন্ট। পাহাড়ি পথের বাঁকে বাঁকে সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে, আর তার সঙ্গে ভ্যালি ক্লাউড মিশে অতি সুন্দর মায়াময় পরিবেশ তৈরি করে।



তেমনই আর কিছুটা এগোতেই দাজু আবার গাড়ি থামালো, আবারও একটি ভিউ পয়েন্ট - নাম "টপ অফ দ্য তরাইন" (top of the terrain)। এখানেও একই অবস্থা হলো, মেঘে ঢাকা সবকিছু। কিছু দেখার উপায় নেই। তাই আর বেশি সময় না নিয়ে এগিয়ে চললাম নামথিং পোখরির দিকে। পোখরি কথার অর্থ পুকুর। তা সে পুকুরে তো এখন জল নেই। কিন্তু হঠাৎ এ পুকুর দেখায়ই বা এতো উৎসাহ কেন বলছি — এই পুকুরে আছে একটি লেজযুক্ত উভয়চর প্রাণী, অনেকটা টিকটিকির মতো দেখতে, নাম স্যালামাণ্ডার। এরা এই লেকের জলেই ঘুরে বেড়ায়, আর জল শুকিয়ে গোলে শুকনো পুকুরের ঝোপ হয়ে যাওয়া অংশে মাটির তলায় দিন কাটায়। এই ধরণের উভচর প্রাণীটি মানুষের কার্য্যকলাপের কারণে খুব কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, এবং এরা সংখ্যায় এতই কমে গিয়েছে যে এই স্থানীয় জীববৈচিত্র্যটি প্রায় বিলুপ্তির মুখে। সেই কারণে এই বড় পুকুরটির চারপাশে বেড়া দেওয়া আছে। এই পুকুরের চারপাশ দেখে, আশেপাশের জঙ্গলে কিছু পাখির খোঁজ করে ফিরে এলাম।



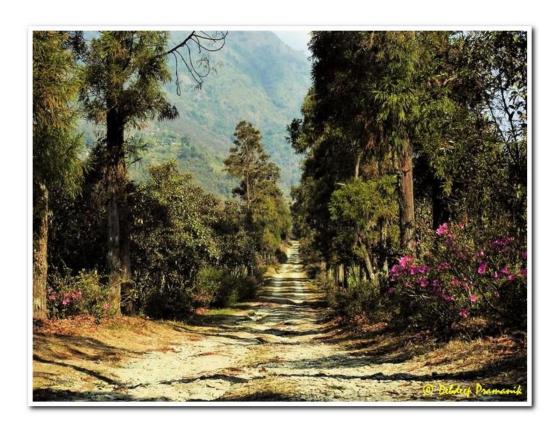
এবার পরের গন্তব্য অহলদাঁড়া। এটি একটি সুন্দর ভিউপয়েন্ট যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্খা দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সুযোগ হলনা, বাধ সাধলো মেঘরাজি। তবে এখান থেকে দূরে অনেকটা নিচের দিকে নদী, তার অববাহিকা, আর ছোটবেলায় খাতায় আঁকা পাহাড়ের সারির মতন সবুজে ঢাকা পাহাড় দেখা যায়। ভিউপয়েন্ট-এর বাঁহাতে একটি পাথরের ঢাল, যার শৈলশিরা এঁকেবেঁকে ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখাবয়ব সৃষ্টি করেছে। নাম রাখা হয়েছে টেগোর রক (Tagore rock)।



র্য্যাপটরদের (যে মাংসাশী পাখিরা তাদের তীক্ষ্ণ বাঁকানো ঠোঁট ও নখর ব্যবহার করে শিকার করার জন্য বা আত্মরক্ষার্থে) মতো আমরাও বার্ডস আই ভিউ পেয়ে গেলাম এখান থেকে। রোদ-ঝলমলে পরিবেশে খানিক সময় কাটিয়ে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য অহলদাঁডা থেকে বেরিয়ে পড়লাম লাটপাঞ্চার -এর উদ্দেশ্যে।



লাটপাঞ্চার-এ সাবির সুব্বা-র হোমস্টে আগে থেকেই বুক করে রাখা ছিল, এখানেও ব্যবস্থা একই রকম, দৈনিক ৯০০ টাকা জনপ্রতি, থাকা-খাওয়া মিলিয়ে। দুপুরের খাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লাম আশপাশটা ঘুরে দেখতে। এখানে দুরাত্রি থাকা, তাই সময় একটু বেশি পাওয়া যাবে। জলে-জঙ্গলে ঘোরার অভ্যেস থেকে যেদিকেই পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়, সেদিকেই রওনা দিই। তাতে মাঝে মধ্যে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয় বৈকি। যেমন এক্ষেত্রে ঘটল। সুব্বার হোমস্টে থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে নীচে যাবার রাস্তা ধরলাম। খানিক পিচরাস্তায় হেঁটে, আমরা পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। বড় বড় ওক, শাল, পাইন গাছের জঙ্গল। উঁচু উঁচু গাছের নিচে ঝোপঝাড়, লতাগুলোর জঙ্গল, খুব ঘন নয়; তবে মাঝে মধ্যে মেঠো পথের মতোও আছে। বেশ পোকামাকড়ের উপদ্রব। সবাই মিলে প্রকৃতির গন্ধ নিতে নিতে বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে চলেছি। কিছুটা এগিয়ে দেখি সামনের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে সারি সারি আয়তাকার স্মৃতিসৌধ। সহজেই বোধগম্য যে আমরা কোথায় এসে পড়েছি। গাছের পাতার আচ্ছাদন আকাশের অনেকাংশ ঢেকে দেয় এই ধরণের জঙ্গলে, ফলত, সূর্যাস্তের সময় ভালো করে পাখি দেখারও জো নেই, উপরম্ভ কিছু হাতির গোবর দেখে, পড়ন্ত বেলায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আর নীচের দিকে যাওয়া সমীচীন মনে হলোনা। ফিরে এলাম রাস্তায়, নামতে থাকলাম নীচের দিকে, কিছুটা এগিয়ে একটা বসতি, গ্রামের নাম শিটং, আরও খানিকটা এগিয়ে একটা রাস্তা ডানদিকে কিছুটা ওপরের দিকে উঠে গেছে, মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণেরে বীট অফিসের দিকে।



মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত, একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা নদী আর অন্যদিকে মহানন্দা। দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত এই অভয়ারণ্যটি শিলিগুড়ি থেকে ২০ কিলোমিটারের মধ্যেই। এর আয়তন ১৫০ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি। শিবখোলা, লাটপাঞ্চার – দুটো জায়গাই এই অভয়ারণ্যের মধ্যে পড়ে। বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে নানারকমের পাখি ছাড়াও রয়েছে হাতি, বাঘ, গাউর, ভাল্লুক ও আরো কত কী। আগামীকাল ভোরের গন্তব্য হল অভয়ারণ্যটির একদিকের অতি ক্ষুদ্র অংশ যেখানে মানুষের কোন বসবাস নেই।



সাবির সুঝা আগেই গাড়ি ঠিক করে রেখেছিল আমাদের কথামত। সাতশো টাকায় যাতায়াত মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের লাটপাঞ্চার বীট অফিস, হোমন্টে থেকে। ভোরের আলো তখন সবে ফুটেছে, সবাই চলেছি নতুন কিছু অভিজ্ঞতার আশায়। পিচরাস্তা থেকে ডানদিক বরাবর ওপরের দিকে উঠে গাড়ি একেবারে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এবার কিছুটা হালকা রোদে সামনের ঝোপঝাড়ে পাখির সক্রিয়তা চোখে পড়ল। তবে চেনা দুরহ। বেশ কিছু সিদ্ধোনা চামের বাগান রয়েছে এখানে। মেঠো রাস্তার দুধারে সারি সারি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। নাম অ্যাজেলিয়া (Azalea), হিমালয়ান গোল্ডেন স্যাফায়ার (Himalayan Golden Sapphire), রডোডেনড্রন ফুলের গাছ, গোলাপি, সাদা দুরকমেরই রয়েছে, এগুলো গুলাজাতীয়, বড় বড় গাছের ছায়ায় থাকতে পছন্দ করে।



আমাদের সঙ্গে গাইড ছিল, নাহলে এজায়গায় প্রবেশ নিষেধ। তাছাড়া জনপ্রতি একশো টাকা প্রবেশমূল্য। যদিও পৌঁছে, প্রবেশদ্বারে যে অফিস আছে, তার আশেপাশে বড়জোর ১৫০-২০০ মিটার যাওয়া যায়, তারপর আর যেতে দেওয়া হয়না। জায়গায় জায়গায় হাতির গোবর পড়ে থাকতে দেখলাম, তাই বোঝাই যাচ্ছে কেন আরো গভীরে প্রবেশ নিষেধ। অফিসের চারদিকে ইলেকট্রিক তারের বেড়া। রোদ আর একটু কড়া হতেই পাখির গতিবিধি বেশিমাত্রায় চোখে পড়ল। সকালের এই সুন্দর নরম আলোয় পাখি দেখার ও তার ছবি তোলার পক্ষে আদর্শ। একজোড়া স্কারলেট মিনিভেট চোখে পড়ল, স্বামী-স্ত্রী আমাদের যথেষ্ট সময় দিলেন ভালো করে দেখার।



আমাদের সঙ্গের বন্ধুরা পাখি দেখায় বেশ দক্ষ, তাই আমাদের আর বেশি বেগ পেতে হয়নি। ওইটুকু অঞ্চলেই অনেক ছোট ছোট পাখি গুলাজাতীয় গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পেলাম। কলকাতার আশেপাশে সহজেই বেনেবৌ (কালো মাথা, হলুদ গা) চোখে পড়ে, এই অঞ্চলে তামারঙের বেনেবৌ চোখে পড়ল। বেশকিছু শিকারি পাখিও দেখা হল। সমতলে নানা ধরণের বসন্তবৌরি (Barbet)চোখে পড়ে, এখানে, প্রায় ১৫০০ মিটার উচ্চতায় গ্রেট বারবেট (Great Barbet) চোখে পড়ল। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে শুধু পাখির ডাক শুনে, পাখি দেখে আর চারিপাশের কত অজানা গাছগাছালি, তার ফুল, ফল, এইসব দেখে, তাদের ছবি তুলে খুব ভালো একটা সময় কাটল। কিছু পায়েচলা পথ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেদিকে রাস্তার ওপরের গাছ, লতাপাতা এমন ভাবে ঝুঁকে পড়েছে যে অনেকটা সুড়ঙ্গের আকার ধারণ করেছে। আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম।



লাটপাঞ্চারের এক পাশে একটি নার্সারি আছে, শুনলাম সেখানেও নাকি অনেক পাখি আসে। শীতের রুক্ষতার পর বসন্তকালে গাছে গাছে নতুন পাতা, সঙ্গে ফুল, যা আকর্ষণ করে নানারঙের ও রকমের পোকা-মাকড় ও প্রজাপতিকে। ফুলের মধু বা মকরন্দ বা পোকামাকড় খেতে এই সময় পাখিদের আনাগোনা ও বেড়ে যায় এই সময়টায়। তাই নার্সারি শুনেই ওদিকে যাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমরা ফিরেই তড়িঘড়ি জলখাবার আর চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাবির সুব্বার সঙ্গে। এবারের গাইড উনিই। শুরুতে সুব্বা ভাইয়া যে দিকে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, লক্ষ্য করলাম আমরা সেদিকে যাচ্ছিনা। কী হল বুঝতে পারছিনা। শুনলাম সুব্বা ভাইয়া ওদেরই একজনের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা বলছেন। খানিক ধাতস্থ হয়ে বুঝলাম, কাছেই কিছু বিশেষ ফুল গাছ আছে, সেগুলোতে মধু খেতে একধরণের আগুনরাঙা মৌটুসী পাখি (Mrs. Gould's sunbird) এসেছে, সেদিকেই এখন যাব আমরা। এই আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের জঙ্গলে একটি চিরহরিৎ গুলা হল এই ফুলগাছটি, যার আকর্ষণেই সেই পাখির ওখানে আসা। বাংলাভাষায় গাছটির কোনও নাম পাওয়া যায় না, তবে অসমিয়া ভাষায় এটিকে তিতাফূল বা রঙ্গবাহক বলে। গাছের ফুলগুলি টকটকে লালরঙের এবং একটি মঞ্জরীদন্দের ওপর সাজানো। গাছটির ফুল, ফল, পাতা সবেরই তেষজ গুণ আছে, এরকমটাই বলে স্থানীয়রা।



লক্ষ্যে পৌঁছে দেখি গোটা দশ-পনেরজন লোক কাঁধে গদার মতো বড় বড় লেন্সওয়ালা ক্যামেরা নিয়ে তাক করে আছে ওই ফুলগাছটার দিকে। উফফ সে এক দৃশ্য বটে! হঠাৎ শুনি পরপর শাটারের আওয়াজ, মানে সেই মৌটুসী দেখা দিয়েছেন। এসব দেখে পাখি দেখার উৎসাহই প্রায় হারিয়ে ফেলছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু বলল, পাশেই একটা গাছে সেই মৌটুসীরই আরেকজন এসেছে। সেদিকটায় গিয়ে পাহাড়ি ধাপে বসে পড়লাম পরিবার এবং বন্ধুসহ, এবার বেশ কাছ থেকে দেখা যাছে। কী তার রূপ! কোনো রং বাদ নেই শরীরে। মাথার ওপর বেগুনি, পিঠের দিকটা টকটকে লাল, বুকের কিছুটা অংশ লাল আর পেটের দিকটা হলুদ, লম্বা লেজের রং বেগনেটে-নীল। ডানায় ব্রোঞ্জ রং। সম্ব্রীক এসেছে সে। নিজেদের মধ্যে খেলা আর ফুলের মধু খাওয়া এই চলছে অবিরত। আরও কিছু পাখি এল, গেল ওই একই গাছে, আমরাও ওই জায়গাতেই ঘন্টাখানেক কাটিয়ে দিলাম। ভাবছি প্রকৃতির কী সৃষ্টি! কোনো ভাষা, কোনো শব্দ কি আছে, তা বর্ণনা করার? এ শুধু দেখার আর উপলব্ধি করার।



বিকেলের দিকে আবার বেরিয়ে পড়লাম জায়গাটা আরও কিছুটা চেনার উদ্দেশ্যে। নীচের বাঁহাতে রাস্তা নেমে গেছে একটা গ্রামের দিকে, গতকাল হেঁটেছিলাম এই রাস্তায় কিছুটা। সেদিকেই হাঁটতে লাগলাম, এবার কোনো গন্তব্য নেই, তবে সন্ধে হলেই ফিরতে হবে, কারণ অন্ধকারে তো পাহাড়ি রাস্তা বুঝতে পারবনা, তারপর কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে উঠব। রাস্তার গায়ে পাহাড়ের পেছনে সূর্যাস্ত হয়েছে, ঝিমিয়েপড়া আলো আর গ্রাম্য জীবন এই দেখতে দেখতে পথ হাঁটছি। কোথাও সবে উনুনে ধোঁয়া দেওয়া শুরু হয়েছে, কোথাও দিনের শেষ আলোয় হিমশীতল জলে চলছে বাসন মাজা, কোথাও পাহাড়ি মেয়েরা সেরে নিচ্ছে দিনের শেষ প্রসাধনী। বাড়ির পুরুষেরা ঘাসের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে দাওয়ায়, কোথাও গৃহিণী চা এনে দিচ্ছে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠকে। ছোট মুদির দোকান হয়তো আর কিছুক্ষণ বাদেই গুটিয়ে নেবে তার পসরা। এভাবেই ছোট হয়ে আসছে দিনের সময়। পুবাকাশে কিছু কালো মেঘের আনাগোনা যেন তারই বার্তা দিচ্ছে, আকাশের আলো নিভে গিয়ে চারিদিকে নিস্তব্ধ পরিবেশ।

সন্ধে পেরোতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল, জানালা দিয়ে তা দেখার সুখানুভূতি ভাষায় ব্যাখ্যা করা আমার সাধ্যি না। তাই সে চেষ্টাই করছি না। বৃষ্টির মাঝে মাঝে আকাশচেরা আলোর ঝলকানি, সিল্যুয়েট-এ আচমকা দেখা পাহাড়, গ্রাম আর মেঘের গুড় গুড় আওয়াজ;ভাবতে-দেখতে-শুনতে সময় কাটছে ভালো। দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা ভিজিয়ে দেয় আমার বাড়ানো হাত। হাতছানি দেয় শুদ্ধিকরণের।



সকাল সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম, আজ যাব আর একটু গভীর জঙ্গলে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের সুব্বা ভাইয়া। গতকাল পাহাড়ের যে ঢালে আগুনরঙা মৌটুসী দেখেছিলাম, তার পাশ দিয়ে আরো অনেকটা নীচে নামার পালা। খুব উঁচু উঁচু গাছের নিচের অংশে ছোটছোট ঝোপঝাড, বড পাথর বসিয়ে বসিয়ে ধাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাথরগুলোয় অতিমাত্রায় অন্রর উপস্থিতি. আর শিশিরের জল পড়ে খুব পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। তাই অতি সাবধানে নামতে হচ্ছে। কিছুটা অংশে পাথরের ধাপের বদলে ভেজা মাটি, নামতে গিয়ে পা হড়কে যাচ্ছে, বিশেষত ঝরাপাতা ভিজে যাওয়ায় ভালো করে পায়ের গ্রিপ পাওয়া যাচ্ছে না। বিপদ বাড়ায় এই পাতার তলায় লুকিয়ে থাকা ডুমুরজাতীয় ফলের উপস্থিতি। গোল গোল ফলগুলি পায়ের তলায় পড়লেই তাল রাখা মুশকিল হয়। ক্রমশ ঘন জঙ্গলের দিকে নামছি, মাঝে কিছু পাখি দেখলেই একটু সময় নেওয়া হচ্ছে। প্রায় ঘন্টাখানেক নামার পর আমাদের গাইড সুব্বা ভাইয়া সবাইকে এক জায়গায় দাঁড়াতে বলল। নিজে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে মনে হচ্ছে, কান খাডা করে একটু ওপরে উঠতেই আওয়াজটা আরো পরিষ্কার হলো। সব্বা ভাইয়া জানান দিলো বাদামি গলা ধনেশ-এর ডাক এটা। ভিতরে ভিতরে খুব উত্তেজিত হলাম, তাহলে দেখতে পাবো বাদামি গলা ধনেশ পাখিটি! সুব্বা ভাইয়া বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দূরে দেখতে পেলাম সেই ধনেশ দম্পতিকে, বাঁদিক থেকে ডানদিকের পাহাডের ঢালের জঙ্গলে উড়ে যেতে। আকারে অনেক বড়, গলা ও ঘাড় উজ্জল বাদামি রঙের, সারা শরীর কালো পালকে ঢাকা, লম্বা লেজের শেষপ্রান্ত সাদা। আর যে বৈশিষ্ট্যটি না বললেই নয়, সেটি হল বড় মোটা হলুদ রঙের চঞ্চ যার ওপর তির্যকভাবে কালো দাগ থাকে। ঠোঁটের ওপর এই দাগ দিয়েই পাখিটির বয়স সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। গাইড বলল, আরো জঙ্গলের মধ্যে যেতে পারলে ওদের বাসাটাও দেখা যাবে। আমরা কয়েকজন ধনেশ পাখির বাসা দেখার জন্য সুব্বা ভাইয়ার সঙ্গে আরো নীচের দিকের ঘন জঙ্গলে নামতে থাকলাম।



জায়গাটায় লতাগুলোর জঙ্গল বেশ ঘন, সঙ্গে বিচুটি গাছের প্রাধান্য। তাই অতি সাবধানে, অথচ খুব দ্রুত যেতে হবে, না হলে ধনেশ পাখির বাসা দেখার সুযোগও ফিকে হবে। আমরা ক'জন প্রায় পড়ি-মড়ি করে ঝোপঝাড় কাটিয়ে এগোচ্ছি, অবশেষে সুব্বাবা ভাইয়া হাত তুলে দিক নির্দেশ করে দেখাল, ওই যে ধনেশযুগল বাসার বাইরের একটা ডালে বসে আছে। চটপট কয়েকটা ছবি তোলা হল। একটি লম্বা গাছের মাঝামাঝি গাছের গুঁড়িতে একটা কোটর রয়েছে, সেখানেই তাদের বাসা গুছিয়ে নিয়েছে ধনেশ দম্পতি। আশেপাশে একই রকম অনেক গাছ আছে, তার কাছাকাছি ডুমুর জাতীয় ফলের গাছও চোখে পড়ল, ওরা প্রধানত ফলাহারী। বেশিক্ষণ দেখার সৌভাগ্য হল না বটে, তবে এই যা দেখলাম, সেটাই বা কম কী? মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল।



আরও কিছু পাখি দেখলাম, তার মধ্যে সুলতান টিট, কয়েকরকমের ফ্লাইক্যাচার, থ্রাশ, স্ট্রায়েটেড বুলবুল উল্লেখযোগ্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পথের ভিজে ভাবটা আর নেই, তাই উঠতে সুবিধে হল। মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ওঠার পালা। বিশ্রামের সময় চোখে পড়ল একটি কাঠি পোকা (stick insect), কী অসাধারণভাবে গাছের সরু ডালের সঙ্গে মিশে রয়েছে, সবসময় চোখেও পড়ে না। এরা গাছের সরু ডালের গঠন হুবহু নকল করে মিশে থাকে, আলাদা করে সাজতেও হয়না।



আন্তে আন্তে উঠে এলাম গ্রামের পথে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির গলি কাটিয়ে চলে এলাম পিচরাস্তায়। এবার গন্তব্য হবে সমতলের দিকে। এই তিনদিনে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হল, সঙ্গে নিয়ে এলাম বেশকিছু স্মৃতি, যা রোমস্থন করে চালাতে হবে বেশ কয়েকদিন। শুনছি পৃথিবীর মানুষের অবস্থা ভালো নয়, পরের বেড়াতে যাওয়াটা, অনেকটাই তাই নির্ভর করে রয়েছে নানাবিধ আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ওপর। তবে আমরা আসি বা না আসি তাতে ওদের দিন্যাপনের কোনো পরিবর্তন হবে না।

এখন মানুষ ভালো নেই, কিন্তু ওরা ভালো আছে।



অধ্যাপনার পাশাপাশি অরুণাচল চ্যাটার্জি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানোটা অভ্যেসে পরিণত করেছেন। বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থিত জীববৈচিত্র্য তাঁকে আকৃষ্ট করে আর তাই জলে-জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘোরার নেশা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সহযোগিতা করে।



কেমন লাগল : - select - 🗸

Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

মত দিয়েছেন : গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please <u>click here to download the Bangla Font</u> and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com © 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher



= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

এক যুগ আগের সতপন্থ-তালের স্মৃতি সুমন্ত মিশ্র

~<u>সতপস্থ তাল-এর প্রচলিত ট্রেক রুট ম্যাপ || সতপস্থ তাল ট্রেকের আরো ছবি</u>~

সেটা আমার দ্বিতীয়বার বদ্রীনাথ যাওয়া - ২০১০। বদ্রী ছাড়িয়ে আরও একটু ওপরে 'সতপন্থ-তাল', সেবার ওখানেই যাওয়া। '৯৮-এ দেখা ছোট্রো বদ্রী ততদিনে জড়সড় বিরাট বিরাট হোটেল, আশ্রম আর ধর্মশালার আড়ালে, - গেরুয়াব্যবসা আমাকেও দাঁড় করিয়েছিল এক মনখারাপের বারান্দায়। মনে পড়ছিল কাজী নজরুলের লেখা - "ভারত জুড়িয়া শুধু সন্ম্যাসী সাধু ও গুরুর ভিড়, / তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড়?" হয়ত আজও দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে এই নিরুত্তর প্রশ্নই ঘুরপাক খায়! তবু এ যে হিমালয়, ক্ষুদ্রতা নীচে রেখে ওপরে ওঠার মন্ত্র এর পথে-প্রান্তরে! তাই উজিয়ে আসা দেশোয়ালির ভিড়ে 'ভালো কিছু'র খোঁজ মিলেছিল সেবারও। সেদিনের ছবি দেখে আজও তার কত কিছুই মনে পড়ে, -খুশি খুশি মন একা একাই কথা বলে। আজ সেই কথাচালাচালির মধ্যে আপনাদেরও সঙ্গী করি। লোকগাথা হল, 'সতপন্থ-তাল'-এর রাস্তা পান্ডবদের স্বর্গে যাওয়ার পথ, যদিও উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষই এমন দাবি করে থাকেন যে, তাঁদের কাছাকাছি উত্তরে পথটাই হল সেই আদি পথ! এতে অবশ্য বিস্নায়েরও কিছু দেখিনা, বাস্তবিকই জায়গাণ্ডলো দেখলে মনে হতেই পারে এইটাই বুঝি স্বর্গের পথ। অন্তত আমার তো তেমনই মনে হয়। যাক,

এ পথের দৈর্ঘ্য মোট ২৫ কিমি। আমরা গিয়েছিলাম প্রচলিত পথ এড়িয়ে, অর্থাৎ 'মানা'র রাস্তায় না হেঁটে মন্দিরের পেছনের রাস্তা ধরে। এতে সুবিধে এই যে রাস্তাও কিলোমিটার খানেক কম পড়ল আর অলকানন্দার ওপর জমে থাকা শক্ত বরফও পেরোতে হল না। অলকানন্দাকে ডানদিকে রেখে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ এসে বাঁক নেয় মানার উল্টোদিকে। পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যায় বদ্রী, শুরু হয় ফুসা ঘাসে ভরা পথ, 'চামতোলি-বুগিয়াল'।

সেবার সেই পথেই গিয়েছিলাম শুধুমাত্র ওই তালটাকে দেখে আসব বলে, কোনও স্বর্গারোহণের জন্য কিন্তু নয়! মুখে যতই

বিরক্তি দেখাই না কেন. আমাদের এ' 'নরক' এর প্রতি যে কী টান তা ঐ স্বর্গের পথে গেলেই বোধগম্য হয়।



বদ্রীনারায়ণের চরণ ধুতে নদীর যেখানে ঝেঁপে আত্মপ্রকাশ সেইখানটুকু সাবধানে পেরিয়ে এসেই 'লক্ষ্মীবন'। কথিত আছে এখানেই দেহ রাখেন দ্রৌপদী, পূর্ণিমা রাতে এখানেই নাকি বেড়াতে আসেন স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণও! আমরাও গলদঘর্ম হয়ে ঢুকলাম কিনা সেই ভূমে! তখন অবশ্য অত-শত ভাবার অবকাশ ছিল না, শুধুই হাঁফ ছেড়ে প্রথম দিনের তাঁবু ফেলা, প্রকৃতির শিশুদের নিশ্চিন্ত রাত্রিবাসের আয়োজন। কিন্তু 'নিশ্চিন্ত রাত্রিবাস' আর হল কই! সারারাতই চলল খেপে খেপে বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে 'আউটার' ভিজে একশা! তাঁবুর ভিতরেও চুঁইয়ে ঢুকল জল। তাই বারেবারে নিজেদের স্যাকেরও অবস্থান বদলাতেই ঘুমের দফা রফা! সে রাতের ভোরও হল ঘোলাটে। আকাশ ফাটা ফাটা নীল, বাকিটা ছাই-কালো রঙে ছাওয়া। দুশ্চিন্তার ঝাঁপি নিয়েই সেদিনের পথ চলার প্রস্তুতি নিই, গন্তব্য চক্রতীর্থ।

সতপন্থ, অর্থাৎ সত্যের পথ, তবেই না সে পথের শেষে স্বর্গ-দ্বারের দেখা মেলে! আর সত্যের পথ, সে তো হবেই কিঞ্চিৎ কঠিন, তাই এ পথে কষ্টও কিছু আছে বটে। লক্ষ্মীবন থেকে চক্রতীর্থ ১১ কিমি পথ, ঘন্টা দেড়েক দুলকিচালে হেঁটেই পৌঁছে যাই অলকাপুরী, ডানদিকে বিস্তীর্ণ পাহাড়ের ঢালে অলকানন্দার উৎসমুখ।



সেই অলকানন্দা, একদা যার জলে হৃদি ভাসিয়েছিলেন জনৈক বাঙালি কবি! অলকাপুরী পর্বতের নীচে এগিয়ে আসা খাঁদু খড়ক্ থেকে জন্ম এই অলকানন্দার। 'খড়ক'-এর অর্থ হল হিমবাহ। খাঁদু খড়ক্ সতপন্থ শৃঙ্গের ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত। কিন্তু ওদিক দিয়ে শৃঙ্গ আরোহণের পথ না থাকায় সতপন্থের অভিযান হয় গঙ্গোত্রী-গোমুখ পেরিয়ে বাসুকিতালের পথ দিয়ে। অলকাপুরী পৌঁছতেই বৃষ্টি নেমেছিল বেশ, চড়াই শুরুর মুখেই ভেজার ভয়ে সবাই যখন আড়াল খুঁজতে ব্যস্ত, তখনই ওপর থেকে নেমে আসতে দেখলাম একদল সুসজ্জিত ট্রেকারকে। পাহাড়ে অচেনা কোনো গন্তব্যে যাওয়ার পথে ফিরতি পথের পথিক দেখলেই মন উৎসুক হয়ে ওঠে খোঁজখবর নেওয়ায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না, কিছুটা গায়ে পড়েই জিজ্ঞেস করলাম, ওপরের আবহাওয়া কেমন, আরও কোনো টিম ওপরে আছে কিনা? যা বললেন তাতে মনটা একটু খারাপই হয়ে গেল! ওঁরা চক্রতীর্থে দুরাত্রি কাটিয়ে আজ বাধ্য হয়ে নীচে নেমে আসহেন, আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ এবং ওখানে এখনই প্রায় চার ফুট বরফ পড়ে গেছে। নেমে আসার সময় চক্রতীর্থের বেশ খানিকটা আগে আরও একটা দলকে দেখেছেন, তাঁরাও নাকি ফিরে আসার জন্য তৈরি হচ্ছেন! বেলচা এবারই প্রথম আমার সঙ্গে এসেছে, ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারি একটু ভয়ও পেয়েছে, তাই ওঁদের বিদায় দিয়ে পরিবেশটা হালকা করতে বলি, আরে সঙ্গে তাঁবু আছে, খাবার আছে, চিন্তা কী! যেখানে গিয়ে মনে হবে আর যাওয়া যাবেনা, ফিরে আসব, সিম্পল! ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে, শুরু হল আমাদেরও নতুন করে চড়াইভাঙা। প্রায় ঘন্টাখানেক চড়াই চড়ে উঠে এলাম এক জল থইথই রাজ্যে - 'সহস্রধারা'।



আশপাশের পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে কুলুকুলু জলম্রোত, কতকটা ঝরনার মতো আবার কতকটা না। ওই জোলো রাজ্যে দূর আকাশের বুকে সেঁটে থাকা পার্বতীর সাদা মুকুট আর মাথার ওপর মেঘ-ফাটা আসমানি-নীল মিলে যে সুন্দর জলছবি তৈরি করল, তা দেখেই সবাই বসে পড়লাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আমাদের জলপানের বিরতি। বিরতি দীর্ঘস্থায়ী হল না, দেখতে দেখতে চারপাশ ছেয়ে গেল সাদা মেঘে, শুরু হল সাবুদানার মত বরফ্রৃষ্টি। আমাদের সহযোগীরা তাড়া লাগালেন, "উঠো সাব, বহুত চলনা বাকি, জলদি জলদি ভাগো।" শুনেছি, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়', পাহাড়ে আমাদের মত ভাগ্যবান পথিকদের বোঝা এঁদেরই তো বরাবর বইতে দেখেছি! তাই আজ জোর গলায় বলি, আমি হিমালয়ের পথে ভগবানের সাহচর্য পেয়েছি।



জল-রাজত্ব পেরিয়ে এসে ধানো গ্লেসিয়ারের মাথায় চড়তেই সবাই সবাইয়ের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, মেঘরাজ্যে পায়ের সামনেটুকু দেখেই চলল পথ চলা। নিস্তব্ধ প্রান্তরে নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনেই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, বেশ কিছুক্ষণ চলে কিছু কথাবার্তার শব্দ যেন শোনা যেতে লাগল! সেই শুভ্র অন্ধরাজ্যে একে একে সবাই গিয়ে মিলিত হলাম সেই দলটারই সঙ্গে, যাঁদের কথা শুনিয়েছিলেন আগের যাত্রীরা। এঁরাও শোনালেন রোমহর্ষক বর্ণনা, কী প্রচণ্ড দুর্যোগ, কী বরফের স্তুপ! এঁরা একধাপ এগিয়ে পাঁচ ফুট বরফের কথা বলামাত্র বুঝতে অসুবিধা হল না, গোচালা থেকে হেমকুণ্ড প্রায় সব চলার পথেই যেমন একদল করে অতিরঞ্জনকারী বাঙালির দেখা পেয়েছি, এঁরাও ওই গোত্রেরই, অন্যকে মানসিক দুর্বল করাতেই যাঁদের পরিতৃপ্তি। ওঁদের সঙ্গে 'খেজুরে আলাপ' সেরে নিশ্চিন্ত মনে আবার এগিয়ে চলা। বেলা যখন প্রায় দুটো, খিদেয় পেট চুঁইচুঁই, পিঠের স্যাকটাকে ইচ্ছে করছে ছুঁড়ে খাদে ফেলে দিতে, তখনই শুরু হল পেঁজা-তুলোর মত বরফ পড়া। আমরা আশ্রয় নিলাম এক প্রকাণ্ড পার্বত্য গুহাতে, মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। টানা প্রায় ঘন্টাখানেক চলল সেই বরফর্ষ্টি, গুহার ভেতর ঘামে ভেজা কাপড় পাল্টে, হালকা জগিং করে নিজেদের উষ্ণ রাখার প্রাণপণ চেষ্টা জারি থাকল আমাদের। বরফ পড়া থামতেই আবার নতুন করে পথ চলা। আধঘন্টা চলেই মুখোমুখি চক্রতীর্থের পথে শেষ চড়াই-এর, শরীর যেন আর চলে না! তবু পাহাড়ে আসা মানেই যে উচ্চতাকে ডিঙ্গিয়ে চলা! এমনই উঠতে উঠতে ওপরে, অনেক ওপরে একটা মানব শরীরকে উচ্ছল হরিণের মত নিচে নেমে আসতে দেখলাম, কাছে আসতে দেখি, ঝাড়া হাত-পা, পেরিয়ে যাবার সময় একটু 'হাই-হ্যালো' পর্ব যা সারা হল! বিচ্ছিরি আবহাওয়াকে সঙ্গী করে টানা প্রায় আট ঘন্টা পথ চলছি, বিদেশিনীর সঙ্গে দু-দন্ড আলাপচারিতার ইচ্ছেও তখন আর অবশিষ্ট নেই। চক্রতীর্থের সবুজে পা দিয়েই প্রথম চোখে পড়েছিল ওঁদের তাঁব।



কিন্তু তখন যে প্রকৃতি প্রলয়ঙ্কর! বরফঝড় সঙ্গী করে বড় একটা পাথরের আড়ালে 'টেন্ট পিচ্' করতেই আমাদের লেগে গেল ঝাড়া চল্লিশ মিনিট। প্রকৃতি যখন শান্ত হল, দু'চোখ ভরে দেখলাম তাকে। আনন্দযজ্ঞের নেমন্তম-কার্ড হাতে না পেলে যে এই দৃশ্য দুর্লভই থেকে যায় অনুভব করলাম আবার। দু'দিন, দু'রাত্রি অপেক্ষার পরও যাঁরা এ'দৃশ্য না দেখেই ফিরে গেছেন, পথেই যে মিলিত হয়েছি তাঁদের সঙ্গেও। বিভূতিভূষণের ভাষায় বললে বলা যায় -"দুর্বল-চিত্ত মানুষের পক্ষে সেরপ না দেখাই ভাল, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন"। আমি ভাবছিলাম, সতপন্তের পথেও যাঁদের সর্বাঙ্গে লেপ্টে থাকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যের বোঝা, তাঁরা হয়ত স্বাভাবিক নিয়মেই এ' দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত থেকে যান!

চক্রতীর্থ আসলে দেবতার পারমাণবিক অস্ত্রাগার। কেন বললাম এ'কথা? কথিত আছে, নারায়ণ তাঁর অস্ত্রাগারের সেরা অস্ত্র, অর্থাৎ সুদর্শন চক্র এখানেই লুকিয়ে রাখতেন, তাই এঁর নাম চক্রতীর্থ। আমার আবার মনে হল চক্রাকারে এখান থেকে বহু তীর্থ দর্শন হয়, তাই এর নাম হয়তো চক্রতীর্থ! পার্বতী, বালাকুন, চৌখাম্বা, কুবের হিমালয়ের এই রথী-মহারথীরা ঘিরে রেখেছে এঁকে।



আমরা যাঁরা নেহাতই পর্যটক, তাদের কাছে এই শিখরগুলোই তো এক একটা তীর্থ! অশান্ত প্রকৃতির আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিসায় চাক্ষুষে যখন সবাই আত্মহারা তখনই আরও চমৎকৃত হওয়ার পালা, নেমন্তম এল ওই বিদেশি দলের সঙ্গে কফি খাওয়ার। ওঁরা, অর্থাৎ ঐ বিদেশিনী ও তাঁর স্বামী, এসেছিলেন পর্তুগাল থেকে, সদ্য বিবাহিত এবং বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মধুচন্দ্রিমাটা সারবেন ভারতবর্ষের পার্বতী শৃঙ্গ জয় করে! সেদিন আমার তাঁবুর জানলায় পার্বতীর দিকে চোখ রেখে শুধু ভেবেছি, এভাবেও ভাবা যায়! নতুন করে ধরা দিয়েছে ভালোবাসার আরেক রূপ, দেখেছি ভালোবাসায় জন্ম নেওয়া নতুন উচ্চতা ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাস! হিমালয়ের আপন দেশের এক নাগরিক শ্রদ্ধায় কুর্নিশ জানিয়েছে ঐ নবদম্পতিকে। অনেক, অনেক বছর পর আই.এম.এফ.-এর এক জার্নালে পড়েছিলাম ওঁদের সফল অভিযানের কথা, আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল মন।

ইচ্ছে ছিল সতপন্থ তালে রাত্রিবাসের, কিন্তু ওঁদের লিয়াজঁ অফিসার জানালেন, আবহাওয়া আগামী তিনদিন আরও খারাপ হতে পারে, তাই তাঁবু এখানে রেখে ঘুরে আসাই ভালো। সেইমতই পরদিন সকালে হাঁটা দিয়েছিলাম দেবতার বৈঠকখানা ছেড়ে অন্তঃপুরের দিকে। চক্রতীর্থের পাঁচিল টপকে ওদিকে নামতেই শুরু হয়েছিল বোল্ডার জোন, সে তো পথ নয়, হিম মিশ্রিত শিলাসমুদ্র! পথ চলতেই দেখেছি বালাকুনের গায়ে হিমপ্রপাতের রোমহর্ষক রূপ, শুনেছি হাড় হিমকরা তার গর্জন! ঐ বিস্তীর্ণ শিলাসমুদ্রে আছড়ে-পিছড়ে শরীর যখন সতপন্থ তাল-এ পোঁছল, সব ভুলে মনে তখন শুধুই লক্ষ্যপূরণের স্বস্তি।



এখানের প্রচলিত লোকগাথা, এই ত্রিকোণাকৃতি সরোবরের তিন কোণে প্রতি একাদশী তিথিতে স্নান সারেন স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ভাবতে ভালো লাগে মানুষ তার সুখ-দুঃখে কী অসীম মমতায় বেঁধে রেখেছে তার ইষ্টদেবতাকে! প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হতে আসা মনে তাতে এতটুকু বিরোধ জন্মায় না। রবি ঠাকুরের গান মনে পড়ে, "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে / সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারও।" আজ প্রায় একযুগ পরেও যখন সবাইকে সতপত্তের গল্প শোনাচ্ছি, তার বরফগলা পান্না-সবুজ জলে শুধুই হৃদয়ের উষ্ণতা।

সতপস্থ তাল-এর উচ্চতা ১৪২৫৮ ফুট। বদ্রীনাথ থেকে মোট ২৫ কিমি পথ। বদ্রী থেকে লক্ষ্মীবন ৯কিমি-উচ্চতা ১২০০০ ফুট। লক্ষ্মীবন থেকে চক্রতীর্থ ১১ কিমি - উচ্চতা ১৩৬৫৮ ফুট। চক্রতীর্থ থেকে সতপস্থ তাল ৫ কিমি। মোট পাঁচ দিনের চলা পথ (তিন দিনে যাওয়া, দুদিনে ফেরা)। যাওয়ার আগে জোশীমঠ-এ ইনার লাইন পারমিট করিয়ে নিতে হয়।



~<u>সতপন্থ তাল-এর প্রচলিত ট্রেক রুট ম্যাপ || সতপন্থ তাল ট্রেকের আরো ছবি </u>~

'হরফ' নামে একটি প্রিপ্রেস ইউনিট চালান সুমস্ত মিশ্র। হিমালয়ের আতিথ্যগ্রহণ ও ফুটবল খেলার দৃষ্টিসুখ তাঁকে অসীম তৃপ্তি দেয়। ভালোবাসেন রবিঠাকুরের গান শুনতে, প্রবন্ধ পড়তে, ছোটগাছকে বড় করতে, বেড়াতে আর নানারকমের মানুষের সাহচর্য পেতে। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় 'আমাদের ছুটি' কিছু সমমনস্ক মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়ায় আনন্দিত।



কেমন লাগল: - select - 🗸

মত দিয়েছেন:

গড়: 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন



কালের বন্দর ও বন্দরের কাল

প্রজ্ঞা পার্মিতা

<u>~ কেরালার আরও ছবি ~</u>

গত বর্ষায় বরুণদেবের বদান্যতায় কেরল যখন আর্ত বিধ্বস্ত তখন তার কিছুদিন আগেই কেরলের আনাচে কানাচে কাটানো দিনগুলোর অপূর্ব স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে মনে মনে বলছিলাম, চেরভূমি, তোমরা আবার ঘুরে দাঁড়াবে। ১৩৪১ খ্রিস্টাব্দে পেরিয়ার নদীর বিধ্বংসী বন্যা তোমাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। এক জনপদ ভেসে গেলেও অন্য এক জনপদ জেগে উঠেছিল! এক রাজশক্তি ক্ষীণ হয়ে অন্য রাজার উত্থান হয়েছিল হয়তো; কিন্তু সাধারণ মানুষ নতুন করে বেঁচে ওঠার নানা সমৃদ্ধ উদাহরণ রেখেছিল, আজও যা দর্শনে মুগ্ধতা আসে। জনসাধারণ মানেই তো দেশ।

কালের ওঠা-পড়ার প্রতিফলন কেরলের যে শহরে সবচেয়ে বেশি অনুভব করা যায় তা হল কোচি বা কোচিন। আরব সাগর আর এই বন্দর শহর মুখোমুখি হয়ে রচনা করেছে যেন দৃষ্টি সুখের উৎসব। এখানে নারকেল বন অনন্তকাল ধরে দেখে চলেছে দুকূলে বদ্ধ খাঁড়ি আর কূলহারা সমুদ্রের পাশাপাশি বৈপরীত্য। সেই নারকেল বীথি, সাগর আর খাঁড়ির জলের মায়ায় যে মানুষগুলোর জীবন কাটে তাদের ওপর সতত খেলা করে ইতিহাস আর ঐতিহ্যের আলোছায়া। এই সবকিছু মিলিয়েই তৈরি হয়েছে কোচির এক একান্ত নিজস্ব পরিচয়। সেই ব্যতিক্রমী বন্দরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনাব আজ।

এক ডিসেম্বরের সকালে কোচিন বিমানবন্দরে নেমেছিলাম আমি ও আমার জীবনসঙ্গী রাজীব। মালাবার শৈলীর ছোউ সুন্দর বিমানবন্দর শহর থেকে ২৯ কিমি দূরে নেদুমবাসেরিতে। নামার একটু আগে আগে চোখে পড়ল পেরিয়ার নদী একেবেঁকে বইছে নিচে। তার ঠিক পরেই নারকেল বনের খুব কাছ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে ফ্লাইট যখন ছোট বিমানবন্দরটিতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল মনে হল এই বুঝি নারকেল গাছের ওপরেই নেমে যায় যায়। কেরালার নির্ভুল দ্যোতক পেরিয়ার নদী আর নারকেল দর্শনে বুঝলাম, ব্যাপটাইজড হয়ে গেলাম চেরভূমি বেড়ানোয়।

বৃহত্তর কোচি আসলে এক যুগা জনপদ, কোচি ও এর্নাকুলাম নিয়ে গঠিত। পূর্বের মূল ভূখণ্ডের অংশ হল এর্নাকুলাম ও পশ্চিমে ভেম্বানাদ লেকের ওপারে হল কোচি। এর সঙ্গে ভাইপিন, বোলগান্তি ইত্যাদি দ্বীপের অবস্থান পুরো এলাকাটাকে যেন লোনা জল আর ডাঙা জমির কাটাকুটি খেলায় পরিণত করেছে। রেলপথে এর্নাকুলাম জংশন সারা ভারতের মানুষকে স্বাগত জানায়। আকাশপথে কোচি ভারত তথা বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত।

এর্নাকুলামের মেরিন ড্রাইভের খুব কাছেই সুবিধাজনক অবস্থানে একটি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম আগে থেকে। দিব্যি সুন্দর কদিনের সেই ঠিকানায় চেক ইন করেই চলে গেলাম খোঁজ খবর নিতে মেরিন ড্রাইভের বোট জেটিতে। এখান থেকেই বিভিন্ন দ্রস্টব্য যেমন ফোর্ট কোচি, মাত্তানচেরি ইত্যাদি বিখ্যাত জায়গায় যাওয়ার বোট ছাড়ে। তাছাড়া এই বোট সার্ভিসই মাকড়শার জালের মত খাঁড়ি ও ভেম্বানাদ হ্রদ দিয়ে বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোকে যুক্ত রেখেছে যা স্থানীয় মানুষেরও এদিক ওদিক যাওয়ার মুখ্য উপায়। কোন কন্ডাক্টেড ট্যুর নয়, নিজেরা ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াব, এমনই বাসনা এযাত্রা। ভাবলাম প্রথমে আরব সাগরের সঙ্গে আলাপটাই সেরে ফেলা যাক জমিয়ে। তাই সেদিন বিকেলের একটা 'সানসেট ক্রুজ' বুক করে ফেললাম।

পড়ন্ত আলো মাখা বিকেলে মেরিন ড্রাইভ থেকে আরব সাগরমুখী এক লঞ্চে ভেসে চললাম সূর্যান্ত দর্শনে। ভেম্বানাদ হ্রদ ধরে পিন্টম দিকে এগোচ্ছিল লঞ্চ। ছোট বড় জাহাজের আনাগোনা দেখতে দেখতে ক্রমশ দুপাশের ব্যস্ত বন্দর এলাকা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। এক সময় বাঁদিকে বিখ্যাত চাইনিজ নেটের সারি চোখে পড়লো। ক্রুজের গাইড জানালো ওটাই ফোর্ট কোচির তটরেখা, যেখানে আমরা পরের দিন যাব বলে ভেবে রেখেছি। কিন্তু এখন আর তট নয়, দেখার শুধু জল আর আকাশের রঙের রায়ট। জলের বিস্তার বাড়তে বাড়তে একসময় দেখলাম সামনে আর কিছু নেই, আদিগন্ত আরব সাগর! সাগ্রহে লঞ্চের সামনের বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়ালাম দুজনে। সেই "জল শুধু জল" দেখতে দেখতে মনে ভিড় করে এলো



কোচিনের ইতিহাসে এই সাগরজলের ভূমিকার নানা প্রসঙ্গ। আরব সাগরের পথেই কোচিন পেয়েছে তার বিশিষ্ট বন্দরের পরিচয়।





মালাবার উপকূলের এই বন্দরের সঙ্গে প্রিস্টজন্মের আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ এবং অবশ্যই চিনের বণিকদের গভীর পরিচয় ছিল। তবুও কোচিন বন্দরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জামোরিন রাজাদের কালিকট অথবা ক্র্যাঙ্গানোর যা বহির্বিশ্বে 'মুজিরি' বন্দর নামে পরিচিত। দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে এবং বিভিন্ন বিদেশি ঐতিহাসিক দলিলে বহু উল্লেখিত কিংবদন্তীসম এই মুজিরি বন্দর দিয়েই ইহুদী, খ্রিস্ট ও ইসলাম এই তিনটি ধর্ম আমাদের দেশে প্রথম পা রাখে। যীশু খ্রিস্টের বারোজন শিষ্যর অন্যতম সেন্ট থমাস এই মুজিরি বন্দর দিয়েই ভারতে এসেছিলেন যার মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। মুজিরি বন্দরে বিদেশি বণিকদের রীতিমতো স্থায়ী বসবাস ছিল। রোমানরা রাজদরবারে দেহরক্ষীর কাজ করত সাগ্রহে। আর ছিল রাজ আনুগত্যে বসবাসকারী হাজার হাজার ইহুদী। কিন্তু কোচির গল্প শোনাতে মুজিরির গান গাইছি কেন মনে হচ্ছে তো? এখানেই ইতিহাসের খেলা। সময়ের নেকনজর যার ওপর পড়ে সে উঠে আসেনতুন গুরুত্ব নিয়ে। ১৩৪১ সনে পেরিয়ার নদীর বিধ্বংসী বন্যায় ভেসে যায় সেই ক্র্যাঙ্গানোর বা মুজিরি। সেখানকার স্বদেশি বিদেশি বণিক সমুদায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে উঠে আসে কোচিনে, কোচিন রাজের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। কোচি ভ্রমণে এই ক্র্যাঙ্গানোরের কথা বারবার উঠে আসে. তাই এই ধান ভানতে শিবের গীত।

কিন্তু কোচির আন্তর্জাতিক পরিচয় তৈরি হওয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ কিন্তু এখনও বলা বাকি। ফোর্ট কোচি আজও বহন করে চলেছে ইতিহাসের এমন কিছু জীবন্ত অভিজ্ঞান যা শুধু দক্ষিণ ভারত বা বৃহত্তর ভারতের নয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিশেষ কালের স্বাক্ষর। যে কাল যে ঘটনা বদলে দিয়েছিল গোটা পৃথিবীর পরবর্তী ইতিহাস! ইতিহাসে বিরক্ত পাঠকরা ক্ষমা করবেন কিন্তু কোচি গেলে ইতিহাস কখনও পিছু ছাড়বে না। ইতিহাসকে সাল তারিখের শিকলে বেঁধে বিরক্তিকর করে তুলেছি আমরা, কিন্তু ইতিহাস তো আসলে মানুষেরই গল্প! রাজা থেকে নাবিক, বণিক বা ধীবর সবাই তো আদতে মানুষ!

সেটা ছিল পঞ্চদশ শতক। সেই সময়ে ইউরোপ অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সমুদ্র পথে ভারতে আসার নতুন রুট আবিক্ষার করতে। প্রায় প্রতিযোগিতাই শুরু হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। ইউরোপের বিখ্যাত রাজদরবারগুলো ভারত-পথ-সন্ধানী অভিযানে বিপুল অর্থ খরচ করতে দ্বিধা করেনি। বহু প্রাচীন যুগ থেকে ভুমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরের পুথে ভারত থেকে মশলা যেতো ইউরোপে। স্থলপথে মূলত সিল্ক রুট ধরে অর্থাৎ মঙ্গোলিয়া ও আরবের পথে। কিন্তু আরব বা পারস্যের মশলা ব্যবসায়ীরা নিজেদের 'ট্রেড সিক্রেট' হিসেবে সঠিক পথের সন্ধান কিছতেই দিতো না। এদিকে তুর্কি অটোমানরা কনস্টান্টিনোপল দখল করার পর সেই পথে বাণিজ্য করায় নানা বাধার সৃষ্টি হল। তুর্কিরা এশিয়া আর ইউরোপের দরজায় কডা প্রহরা বসালো এবং সে পথের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করলো। এভাবে জলপথ স্থলপথ দই হয়ে উঠল বিতর্কিত। এই পরিস্থিতি কিছুকাল চলতে লাগলে ফ্যাকাসে সিদ্ধ খাবারে অরুচিগ্রস্ত ইউরোপ অবিলম্বে নিজেরাই মশলা আমদানি করে সমস্যার সুরাহা করতে খেপে উঠলো। ইউরোপ জুডে প্রায় প্রতিটি রাজ পরিবারে একই আলোচনা। হায়, কবে ফিরবে খাবারে লোভনীয় গোলমরিচের ঝাঁজ বা দারুচিনি এলাচের সুগন্ধ! একমাত্র যদি অপ্রচলিত অন্য পথ খুঁজে নিজেরা সরাসরি মশলার ভাণ্ডারে পৌঁছনো যায়! ব্যাস, সাজো সাজো রব উঠলো, শ'য়ে শ'য়ে জাহাজ জলে ভাসলো শুধু ভারতে পৌঁছবে বলে! পর্তুগাল ও স্পেন সবচেয়ে তৎপরতা দেখিয়েছিল। ভারত খুঁজতে বেরিয়ে কলম্বাসের পায়ে পায়ে স্পেন হাজির হল দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে পর্তুগালের পদচিহ্ন পড়লো ভারতে। নামলো কালিকটে অর্থাৎ বর্তমান কোঝিকোড়ে, ১৪৯৮ সনের ২০ মে। তখন মালাবার উপকূলে প্রভাবশালী 'জামোরিন' রাজাদের রাজত, যাদের রাজধানী ওই কালিকট। ভাস্কো দা গামা ভেবেছিল তাকে দেখে কালিকটের রাজা এমন ভাব করবে যেন "তুমি আসায় আমি কেতাখ"! সে তো নয়ই উল্টে পর্তুগালের সঙ্গে মশলা বাণিজ্যে আগ্রহই দেখালো না! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ভাস্কো দা গামা নানা ভাবে নিষ্ঠর প্রতিশোধ নেয় সে প্রত্যাখ্যানের। কিন্তু এসবও তো সেই কালিকট বন্দরের কথা।

কোচিনের সঙ্গে কী সম্পর্ক! সে কথায় আসছি। ভাঙ্কো দা গামা দেশে ফিরে অভিযাত্রী হিশেবে প্রভূত সম্মান খ্যাতি পেলেও অভিযানের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ পর্তুগীজ রাজত্বের বাণিজ্য দৌত্য তো সফল করতে পারেননি। সুতরাং পর্তুগিজরা বিশাল ব্যয়ে আবার অভিযানে নামল এবং এইবার তারা ভিন্ন পথ নিলো। জামোরিনের শক্ররাজ্য কোচিনের সঙ্গে সংযোগ করলো। কোচিন বেশ কিছুকাল ধরে কালিকট রাজাদের পরাক্রমে পর্যুদন্ত। সুতরাং তারা 'শক্রর শক্র আমার মিত্র' এই মতে বিশ্বাস রেখে আলিঙ্গন করলো পর্তুগীজদের। বুঝল না যে উপনিবেশের প্রথম ইটটা তখনই পাতা হল। সেই পথেই এর দেড় শতক পরে এলো ডাচ এবং তার পর ইংরেজ। কোচি একমাত্র জায়গা যেখানে পর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজ তিনটি জাতিরই উপনিবেশ ছিল।

সেই থেকে ভারতের মশলা রফতানির রাজধানী কোচি। স্পাইস বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার হেড কোয়ার্টার এখানে। শুধু তাই নয় সারা পৃথিবীর গোলমরিচ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল পেপার [গোলমরিচ] এক্সচেঞ্জ'-এর হেড কোয়ার্টার এখানেই। ২০১১ সালে এখানে ওয়ার্ল্ড স্পাইস অর্গানাইজেশন গঠিত হয়েছে।



ইতিহাস থেকে মন সরাতে বাধ্য হলাম যখন কমলা রঙের মেরজাই পরা সূর্য সুদ্রবিস্তারী সাগরের পাটে বসল প্রথমে, তারপর ডুব দিল। আরও কিছুক্ষণ আকাশে রঙের ওপর রঙের খেলা চলল। তারপর আলোর ছোঁয়াচ কমতে কমতে কালোর আভাস দেখা দিল। এই পুরো সময়টুকু আত্মস্থ করে নিলাম চিরকালের মতো। পাশে এক ইউরোপিয়ান যুবক এসে দাঁড়িয়েছে কখন খেয়াল করিনি। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে বেশ সুন্দর আমন্ত্রণী হাসিসহ 'হাই' করলো। ভুবন গ্রামের বাসিন্দা আমরা দুজনেই, তাই রাজীব সৌজন্যসূচক টুকটাক কথা জুড়লো ছেলেটির সঙ্গে! সেও দিব্যি গল্প জুড়ে দিল। ছেলেটি ডাচ, তবে ট্যুরিস্ট নয়, ছাত্র। কলোনিয়াল আর্কিটেকচার নিয়ে গবেষণা করছে। ডাচদের তৈরি বোলগান্তি প্যালেস নিয়ে কাজ করছে এখন। সে যখন আমাদের সঙ্গে কথোপকথনে রত, আমার মনে কেমন অদ্ভুত এক ত্রিভুজের ছবি ভেসে উঠল। ত্রিভুজের আধার আরব সাগর, যার ওপর মিলিত বাকি দুটি বাহুর একটি ইউরোপীয় ছেলেটি ও অন্যটি ভারতীয় আমরা। এ ত্রিভুজ কোচির রূপক! চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম তীরহীন কালো জলে যেন এক ক্ষুদ্র মোচার খোলায় ভাসছি। ঠিক যেমন কোচিন আর আরব সাগরের অনন্ত কালচক্রের অতি ক্ষুদ্র এক টুকরো কালের অধিকারী হলাম আমরা আজ সন্ধায়।

ফেরার পথে দেখি মেরিন ড্রাইভের রেইনবো ব্রিজ, চাইনিজ নেট ব্রিজ ইত্যাদি সুন্দর ছোট থিম ব্রিজগুলো আলোর সাজে অপরূপা। তবুও নিষ্প্রভ লাগছিল কারণ মনে শুধুই সানসেট ক্রুজের মায়া।

পরদিন সকালে দক্ষিণী প্রাতরাশ সেরে সারা বেলার মতো প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বোট বাহনে গন্তব্য ফোর্ট কোচি। এটাই পুরনো কোচিন যেখানে ভারতের প্রথম বিদেশি উপনিবেশের চিহ্ন বর্তমান। প্রকৃতি ও ইতিহাসের সাহচর্যময় মনোরম সময়ের আকাজ্ঞায় পা রাখি ফোর্ট কোচিতে। বিচ ধরে হাঁটাহাঁটির সুন্দর ব্যবস্থা। প্রথমেই পড়লো ভাস্কো দা গামা স্কোয়ার। সেটা ছাড়িয়ে বিচ ধরে দক্ষিণ মুখো হাঁটতে লাগলাম। ডানদিকে ক্রমাগত সাগরের ছলাৎছল, আর বাঁদিকে ইতিউতি গড়ের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়তে লাগলো।



১৫০০ খৃস্টাব্দে পেদ্রো আলভারেজ কাব্রালের নেতৃত্বে পর্তুগীজদের দ্বিতীয় ভারত অভিযান সফল হয়েছিল এই কোচিতে এসে। অভিযানের সাফল্য বলতে প্রথমত মশলা রফতানি চুক্তি বোঝালেও ধীরে ধীরে তারা এখানে আসন পেতে বসে। কোচিন রাজাদের অনুমতিক্রমে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পত্তন করে সান্টা ক্রুজ টাউন যা এশিয়ার প্রথম ইউরোপিয়ান টাউনশিপ। তাকে ঘিরে গড়ে তোলে পর্তুগাল-রাজের নামাঙ্কিত ফোর্ট ইমানুয়েল। বর্তমানের 'ফোর্ট কোচি' নামটা ওই গড় পত্তনের ইতিহাসেরই প্রতিফলন।

আরব সাগর তীরে এই বিশাল গড়ের প্রবল উপস্থিতি দেড়'শ বছর পর ডাচরা এসে নস্যাৎ করে দেয়। ধ্বংস করে প্রায় সবই। ফোর্ট ইমানুয়েলের প্রতিনিধিত্ব করছে দেখলাম একটা ছোট কামান সহ গানারি! আর পুরনো বন্দরের অনতি অতীত সক্রিয়তা জানান দিতে দুটি বিশাল স্টিম বয়লার আছে মাত্র। বাকি যা রয়ে গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার মাঝেই পরবর্তীতে তৈরি ডাচ উপনিবেশের নিদর্শন ডাচ কোয়ার্টার, ডাচ সেমিট্রি দেখে নিলাম ঘুরে ঘুরে।

এবার ডাচদের হাতে ধ্বংস না হওয়া একমাত্র অবশিষ্ট পর্তুগীজ নিদর্শন সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ দেখতে গেলাম। অ্যালবুকার্কের তৈরি এই চার্চ ভারতের প্রাচীনতম ইউরোপিয়ান চার্চ! গড়নে আহামরি বিশেষত্ব নেই, তবু কোচি দর্শনে অবশ্য দ্রষ্টব্য এই চার্চটি! কারণ ভাস্কো দা গামা - যার হাত ধরে পৃথিবীতে 'আবিক্ষারের যুগ' [Age of Discovery] শুরু, যার পদচিহ্ন ধরে আমাদের তথা সারা বিশ্বের ঔপনিবেশিক নির্মমতার সূত্রপাত, ইতিহাসের সেই অন্যতম কালপুরুষের দেহ দীর্ঘ পনেরো বছর এখানে সমাহিত ছিল।



ভাঙ্কো দা গামা তাঁর তৃতীয় দফা ভারত অভিযানে এসে কোচিনে ১৫২৪ সনের ক্রিসমাস ইভের দিন মারা যান। শোনা যায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁকে এই সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল প্রথমে, পরে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পাঁচশ বছর বয়সী গির্জাটির ফাসাদে পর্তুগীজ স্থাপত্যের ছোঁয়া স্পষ্ট। অন্দরে প্রবেশ করে দেখলাম অ্যাংলিকান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় স্যাংচুয়ারিতে মূর্তির বদলে ক্রুশ এবং বাইবেলের বাণী শোভিত। স্থাপিত হওয়া থেকে এই গির্জায় তিনধারায় উপাসনা হয়েছে! পর্তুগিজ আমলে ক্যাথলিক, ওলন্দাজ আমলে প্রটেস্টান্ট এবং শেষে ইংরেজ আমলে এসে অ্যাংলিকান। ঈশ্বর পুত্রকে নিয়ে যদি এমন টানাটানি হয়, খোদ ঈশ্বরকে নিয়ে তা তুমুল আকারে হওয়াই স্বাভাবিক। মনে মনে হেসে গির্জার চিরাচরিত অভ্যন্তরের আসবাবে চোখ বোলাতে লাগলাম। সারি সারি পিউ, স্যাংচুয়ারির ঠিক বাইরে বাঁ দিকে কারুকার্যময় পালপিট, ডান দিকে যথাযথ লেকটার্ন। দ্রুত দেখা সেরে যেখানে ভাস্কো দা গামার দেহ রাখা ছিল সেই স্যারকের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। এই সময় আমার ইতিহাস চেতনা মুহুর্তের জন্য দ্বন্দে দীর্ণ হয়েছিল। শেষে নির্মোহ ইতিহাস দর্শনের জয় হল। ভাস্কো দা গামার দুঃসাহসী অভিযাত্রী সত্তাকে শ্রদ্ধা জানালাম আর সেই মানুষটিকে উপেক্ষা করলাম যার নির্ম্বুরুতার কাহিনী মালাবার উপকূলে আছড়ে পড়া আরব সাগরের প্রতিটা ঢেউ জানে।



পর্তুগীজরা ছিল রোমান ক্যাথলিক আর ডাচরা প্রটেস্টান্ট। ইতিহাসের চিরাচরিত প্রথায় শাসকের ধর্মই প্রধান, সূতরাং ডাচরাও সব ক্যাথলিক স্থাপত্য ধ্বংস করে দেয় বাদে সান্টা ক্রুজ ক্যাথিড্রাল ও সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ! কিঞ্চিৎ ইতিহাস চেতনা দেখিয়েছিল ভাবা হয়ত বাড়াবাড়ি হবে কিন্তু আমার তাই ভাবতে ভালো লাগল। সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ দেখেই চলে এলাম সেই সান্টা ক্রজ ক্যাথিড্রাল দেখতে। ব্যাসিলিকার মর্যাদাপ্রাপ্ত গির্জাটি কেরলের অন্যতম ঐতিহ্যময় স্মারক। কালের এমন উপহাস, গির্জাটি ধ্বংস না করলেও ওলন্দাজরা অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যবহার করত একে। কিন্তু ইংরেজরা এসে এটিকেও ধ্বংস করে দেয়। রয়ে যায় কিছু চিহ্ন যা এখানে ও ইন্দো-পর্তুগিজ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। পরবর্তীকালে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয় গির্জাটি। মুছে যাওয়া সান্টা ক্রুজ টাউনের 'নাম চিহ্নু' বহনকারী একমাত্র স্থাপত্য সান্টা ক্রুজ ব্যাসিলিকা চতুরে পা রাখি; এবং গির্জাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুগ্ধ করে রাখে। গথিক স্থাপত্যের বাহির ও অন্দর দুই সমীহ আদায় করে।

দুটি চূড়াবিশিষ্ট গির্জাটির বহিরঙ্গের সৌন্দর্যে ভাবগান্তীর্যই প্রধান। কিন্তু অভ্যন্তরে আবেগ ও শিল্পের সন্তুলিত সুষমা। দেয়াল ও খিলান যীগুপ্রিস্টের জীবন আধারিত ফ্রেক্ষো ও ম্যুরালে সজ্জিত। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গির্জা, তাই অলটারে ঈশ্বরপুত্রের মূর্তি বিরাজিত! তার ঠিক ওপরে দা ভিঞ্চির লাস্ট সাপারের অনুকরণটি অনবদ্য। স্টেইনড গ্লাসের জানলা, কারুকার্যময় পালপিট ইত্যাদি তো নজর কাড়লোই, তবে সবচেয়ে মুগ্ধ হলাম সিলিঙের সাতটি ক্যানভাস দেখে। এক্ষেত্রে আমার অবলম্বন ক্ষুদ্র একটি স্পোর্টস গ্লাস, খুঁটিয়ে দেখার পিপাসা মেটাতে যার দিকে হাত বাড়াই। ছবির বিষয় 'ভিয়া ক্রুশিস' যার শান্দিক অর্থ 'ক্রুশের পথ' এবং তাৎপর্য হল 'গভীর যন্ত্রণা'। যীগুর শেষ যাত্রার ওপর আঁকা দৃশ্যগুলো মন ভিজিয়ে দিল। দু দণ্ড আকুল হয়ে প্রার্থনা করলাম! মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক, কিন্তু যে মৃত্যু মনুষ্যত্বের মৃত্যুর দ্যোতক তার আর কত সাক্ষী হব আমরা!

ভারী মন নিয়ে আবার বিচে ফিরে এলাম! সমুদ্র মুহূর্তেই শুশ্রষার পরশ দিল প্রাণে! প্রকৃতির কাছে বার বার ফিরতে এই জন্যেই



ভালো লাগে। মনোযোগ ফেরালাম চাইনিজ নেটে। বিচ ছাড়ার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণের কথা না বললে কোচির গল্পই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট এই মাছ ধরার জাল প্রসঙ্গেও ইতিহাস ছাড়া গতি নেই। এই জালের টেকনিক এখানে আমদানি হয় কুবলাই খানের দরবারের বদান্যতায়। আজও এই জালেই মাছ ধরা হয় সারা কেরালায়।



ফোর্ট কোচি থেকে অটোর স্থানীয় সংস্করণ টুকটুক চড়ে পুরনো কোচির অন্যতম অংশ মান্তানচেরি চলে আসি। বাসনা সুবিখ্যাত মান্তানচেরি প্যালেস, জিউ টাউন, সিনাগগ ইত্যাদি চাক্ষুষ করা। পর্তুগীজরা মান্তানচেরি প্যালেস তৈরি করে কোচিন রাজাদের উপহার দেয়! পরে ডাচরা সংস্কার করে বলে ডাচপ্যালেস নামেও পরিচিত। দেখে অবাক হলাম বিদেশিরা বানালেও এটি মালাবার স্থাপত্যশৈলী 'নালুকেন্তু' অনুযায়ী তৈরি; যার বৈশিষ্ট্য হল চার বাহু যুক্ত ভবন এবং মাঝখানে খোলা চতুক্ষোণ! দোতলা প্রাসাদের প্রতিটি দেওয়াল রামায়ণ মহাভারত বিষয়ক টেম্পেরা শৈলীর অপূর্ব ম্যুরালে সজ্জিত। সে ছবি দেখতে কেরলের আরেক রাজ পরিবারের সন্তান সুবিখ্যাত তৈলচিত্র শিল্পী রাজা রবিবর্মার কথা মনে পড়তে বাধ্য। বিদেশি মাধ্যম আর ভারতীয় বিষয়ের সাযুজ্যের কারণেই। কোচিনরাজাদের ব্যবহৃত নানা জিনিষের চেয়ে প্যালেসের কাঠের কাজের শিল্পসুষমা ও কেরালার নিজস্ব শৈলীর মেঝে দেখে বেশি মুগ্ধ হলাম। রাজার শয়ন কক্ষের কাঠের কারুকাজে বিলাস ও শিল্পের চরম উৎকর্ষ দেখে আমি তো বাক্যহারা! আর নারকেল খোলা পুড়িয়ে তার সঙ্গে লেবুর রস, ডিমের সাদা ইত্যাদি আরও অনেক কিছু মিশিয়ে কোনো এক অজানা জটিল পদ্ধতিতে যে এমন ইটালিয়ান মার্বলের মত ঝলকানো কালো মেঝে তৈরি হয় প্রথম জানলাম! অবিশ্বাস্য পুলকে খালি পায়ে দৃপাক হেঁটেও নিলাম।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে জিউ টাউনে এসে মনে হল যেন আস্ত এক 'অ্যান্টিক ল্যান্ড'-এই এসে পডেছি। মাত্তানচেরির ইহুদীদের ইতিহাস গল্পকে হার মানায়। মালাবার ইহুদীদের মতে, জেরুজালেমে রোমানরা যখন দ্বিতীয় বার [1st AD] ইহুদীদের পবিত্র মন্দির ধ্বংস করে দেয় তাদের একটি দল মালাবার উপকূলে এসে ক্র্যাঙ্গানোরের রাজাদের কাছে আশ্রয় চায়। রাজানুগ্রহে প্রায় হাজার দশেক ইহুদী সেই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ইহুদীদের যেহেতু ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্রবল, মুজিরি বন্দরে ও অন্যত্রও দ্রুত তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। রাজকোষ বৃদ্ধিতেও দারুণ সহায়তা করে তাদের উপস্থিতি। ফলে ক্র্যাঙ্গানোরের রাজা ভাস্কর বর্মা সসম্মানে ইহুদীদের নেতা জোসেফ রাব্বানকে তাম্রপত্র লিখে ইহুদী জনগোষ্ঠীর নামে প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিকানা এবং অন্যান্য নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। মালাবার জিউদের বিশ্বাস এই ঘটনা ৩৭৯ খ্রিস্টাব্দের। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে তা ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। তবে মালাবার উপকলে ইহুদী উপস্থিতি যে ২০০০ বছরেরও পুরনো এনিয়ে সন্দেহ নেই কারো। কারণ যীশুখ্রিস্ট মারা যাবার পরেই যখন সেন্ট থমাস মুজিরি বন্দরে আসেন সে ঘটনার প্রামাণ্য বর্ণনায় আছে যে এক ইহুদী কন্যা তাঁকে ফুট বাজিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল. অভ্যর্থনাকারী দলের সদস্য হিসেবে। জিউদের সেই 'নিশ্চিন্তের বারাণসী' ক্র্যাঙ্গানোর বন্যায় ভেসে গেলে সেখানকার পাট তুলে তারা মাত্রানচেরিতে চলে আসতে বাধ্য হয়। কোচিতে আগে থেকেই ইহুদী বসবাস ছিল, তাদের সঙ্গে নিয়ে এখানেও আবার উঠে দাঁডায় তারা। গড়ে তোলে মান্তানচেরি জিউ টাউন. সিনাগগ ইত্যাদি। মাথায় এই সব তথ্য এবং হৃদয়ে অনুভব নিয়ে জিউ টাউনের পথে যখন হাঁটছি মনে হল এ তো এক জীবন্ত জীবাশা জনপদ! জিউ স্ট্রিটের দোকানগুলিও এমনিতে অ্যান্টিকের জন্য বিখ্যাত। দু পাশে সেই অবাক করা সন্তার বাইরে থেকে দেখে দেখেই অবাক হতেও ভূলে গেলাম একসময়। একটা নোঙর, একটা অপূর্ব গড়নের শালতির সামনে মিনিট পনেরো দাঁডিয়েছিলাম। সিনাগগের পথে যেতে রাস্তার দূপাশের বাডি ঘর দেখতে দেখতে চকিতে এক দরজায় দেখলাম বলিরেখায় কারুকার্যময় এক বৃদ্ধার মুখ। যেন 'সময়' এক ঝলক দেখা দিল আমায়। তাকে চিনতে পারায় যেন ছাডপত্র পেলাম সিনাগগে প্রবেশের।



মান্তানচেরির সিনাগগটি ভারতের প্রাচীনতম সক্রিয় সিনাগগ অর্থাৎ আজও প্রার্থনা হয় সেখানে। প্রবেশ মাত্র মুগ্ধ হলাম সোনালি রেলিংঘেরা ইহুদীদের প্রার্থনা বেদীটি দেখে, যার ওপর দাঁড়িয়ে পুরোহিত ধর্মোপদেশ দেন বা ধর্মগ্রন্থ পড়েন। পরে জেনেছি একে 'বেমাহ্' বলে। বেদীটি চার্চের 'পালপিট'-এর চেয়ে অন্যরকম গড়নের। বেশ কিছু প্রথাগত চার্চ দেখার সৌভাগ্য হলেও অভাগার ভাগ্যে এই প্রথম সিনাগগ প্রবেশ। তাই বাইবেলের প্রথমার্ধের [Old testament] অংশীদার ইহুদীদের সবকিছুই ক্রিশ্চিয়ানিটির রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। হাতে আঁকা চিনা পোর্শলিন টালি দিয়ে তৈরি সিনাগগের মেঝেটি আশ্চর্য সুন্দর। যার বৈশিষ্ট্য প্রতিটি টালির ডিজাইনই আলাদা। ইহুদী ধর্মগ্রন্থ 'তোরাহ' রাখা আর্কটি হলিউড প্রাণিত আমাদের 'ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দা লস্ট আর্ক' সারণ করাল। এখানেই সেই বিখ্যাত তামপ্রতির রাখা আছে যা দেখে এবং আরও অসংখ্য অ্যান্টিক সামগ্রী দেখতে দেখতে বিমোহিত অন্য এক অনুভবে পৌছে গেলাম। তামপ্রটির একটি রেপ্লিকা সংগ্রহ না করে থাকতে পারিনি। ভারতের চিরন্তন 'এস জন, বসো জন' দর্শনের এক জীবন্ত দলিল মনে হয়েছিল আমার জিনিসটা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেঞ্জামিন নেতান্যুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এই তামপ্রের একটি রেপ্লিকাই উপহার দিয়েছিলেন।

মাত্তানচেরির একটি ওয়ার্ল্ড ইভেন্ট হল 'কোচি মুজিরি বিয়েনালে' শিল্প প্রদর্শনী। শিল্পে আগ্রহীরা খোঁজ নিয়ে সেই সময় আসতে পারেন। এই প্রদর্শনী এশিয়ার বৃহত্তম সমকালীন শিল্প প্রদর্শনীর মর্যাদাপ্রাপ্ত। কোচির কাছে 'মুজিরি' শব্দের আবেদন কতটা গভীর এই নাম থেকে তা বোঝা যায়।

মাত্তানচেরিতে কিঞ্চিৎ ভোজন সেরে প্রথমে উইলিংডন ও তারপর বোলগান্তি দ্বীপে গেলাম। উইলিংডন কৃত্রিম দ্বীপ। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কোচি বন্দরের আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ভেম্বানাদ হ্রদের নাব্যতা বাড়াতে যে মাটি তুলে তুলে জমা করা হয় তাই দ্বীপের রূপ নেয় যা বর্তমান কোচি বন্দরের কেন্দ্রীয় অংশ। কারণ এখানেই কোচি পোর্ট ট্রাষ্টের বিশাল অট্টালিকা। এখানেই ভারতীয় নৌসেনার সাউদার্ন ন্যাভাল কমান্ডের বেস।অন্যান্য আরও গুরুত্বপূর্ণ অফিস কাছারি ও প্রচুর হোটেলের সমাহার দেখলাম। বোলগান্তি দ্বীপের আকর্ষণ নিরিবিলি পরিবেশে বোলগান্তি প্যালেস যা ডাচদের কলোনিয়াল আর্কিটেকচারের একমাত্র অবশিষ্ট নিদর্শন। দুঃখের বিষয় তা এখন হেরিটেজ হোটেল হওয়ায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। সানসেট ক্রুজে আলাপ হওয়া ডাচ যুবক এই প্রাসাদটি নিয়ে গবেষণা করছে। প্রাসাদের সামনে জলের ধারে বসে কিছুক্ষণ সূর্য ডোবার আয়োজন দেখে মেইন ল্যান্ডের ফেরি নিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় কথাকলির অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়া ঠিক ছিল। নৃত্যের বিষয় রাবণ ও মন্দোদরীর প্রেমোপাখ্যান। নাচ, সাজ তো বটেই বিষয়ের জন্য এক কথায় চমৎকৃত হলাম। আমরা বাংলাভাষী, যে ভাষার নাট্যকাব্যে মেঘনাদ নায়ক! সুতরাং এই ভিন্ন আখ্যানের রসে দারুণ মজেছিলাম। পরিদিন সন্ধ্যায় হালকা কেনাকাটা করতে গিয়ে যখন কথাকলির মুখোশ কিনে ফেললাম বুঝলাম তখনও সেই নাচের স্মৃতি মনে জেগে আছে। আর কিনেছিলাম এক ছোট্ট মালাবারি নৌকা, কারণ সেদিন অর্থাৎ আমাদের কোচিবাসের শেষদিন খাঁড়ির জলে ভেসে ভেসে কাটিয়েছিলাম সারা বেলা।



কোচি থেকে ব্যাকওয়াটারের আশ্চর্য জীবনযাত্রা দেখতে যাওয়াটা শেষ দিনের জন্য তুলে রেখেছিলাম ইচ্ছে করেই যাতে রেশ রয়ে যায়। চের জাতির নিজস্ব শৈলীর জলযান 'কেতুবালামে' চড়ে কোচি-ভাইকোম ব্যাকওয়াটার সফর শুরু হল। নগর বন্দর আড়াল হতেই নারকেল গাছের সারি মাথা দুলিয়ে অভ্যর্থনা জানালো! আহা, ওপরে নীল আকাশ নিচে সবুজাভ জল এবং আমরা এক শিল্পময় জলযানে আসীন! সবই মনোরম মধুরম! দেখি খাঁড়ির গা ঘেঁষে গ্রামের ঘরদোর, সে ঘরের দোরেই নৌকা এসে দাঁড়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছু নিয়ে! আনাজপাতির নৌকা দেখলাম, মাছের তো আছেই! একটা নৌকা থেকে বাসনকোসন কেনাকাটা চলছিল, তাতে নানা সাংসারিক টুকিটাকি সহ খেলনাও চোখে পড়ল। স্কুলের পোষাকে ছেলে মেয়েরা স্কুল যাছে। তাদের নৌকা হাঁসের দলের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। প্রচুর হাঁস সারা খাঁড়ি জুড়েই। দুপারের মানুষগুলোর জীবিকা মূলত মাছ ধরা আর 'কয়ার' বানানো। জল ছুয়ে বাস করে এরা, নিত্য যাতায়াতও এই জল বেয়েই। আক্ষরিক অর্থেই জীবনের জলছবি।



একসময় দুপুরের বিরতিতে সেই জলছবির দু দণ্ড শরিক হতে নামলাম। এক ঝলক কয়ার তৈরির কর্মকাণ্ড দেখে নিয়ে ফিরে আসতেই জলটুঙির বৃহৎ সংস্করণ এমন একটা জায়গায় আমাদের জন্য মালাবারি আহার পরিবেশিত হল। সুবিখ্যাত মিন কারি সহযোগে কলাপাতায় লালচে চালের ভাত দারুণ উপভোগ্য। মজাদার অনুষঙ্গ ছিল পাকা কলা ভাজা! জলজ গন্ধের মাঝে নারকেল গাছের হাওয়ায় বসে সেই মালাবারি মধ্যাহ্নভোজন আমাদের ভ্রমণকে সম্পূর্ণতা দিল। ফিরতি পথে দেখি ছোট ছোট শালতিতে সিমেন্ট, বালি, ইট বয়ে এনে চলছে ঘর বাড়ি তোলা। বেঁচে থাকার চিরন্তন দৃশ্য! কোন ভরসায় জলের ওপর ভিত গড়ে মানুষ! এলোমেলো হাওয়ায় সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল প্রকৃতি বা ইতিহাস যতবার তছনছ করে দিক তার জীবন জীবিকা, মানুষ আবার ঠিক ঘর বেঁধে নিতে পারে। ইতিহাস তো বার বার তাই দেখিয়েছে।



<u>~ কেরালার আরও ছবি ~</u>

প্রজ্ঞা পারমিতা ভ্রমণ কাহিনি, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস লিখছেন গত বছর দশেক। মেডিক্যাল জার্নালিজম করেছেন 'বর্তমান'-এর প্রকাশনা 'স্বাস্থ্য' পত্রিকায়। 'মাতৃশক্তি' ও 'জাগ্রত বিবেক' পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে কলম ব্যবহার করে থাকেন।



গড়: 0.00

কেমন লাগল : - select -মত দিয়েছেন :

Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন



স্বর্গীয় দেওরিয়াতাল

অরিন্দম পাত্র

"পথিবীর থেকে ভারী কে?... মাতা আকাশের থেকে উঁচু কি?... পিতা পবনের থেকেও তীব্র গতি কার?... মনের সংখ্যায় তৃণের থেকে অধিক কি?... চিন্তা

সবচেয়ে বড় আশ্চর্য কি?... সবাই জানে মৃত্যু অন্তিম সত্য কিন্তু সবাই ভাবে বোধহয় তার সেই গতি হবে না।"

অনেক ছোটবেলায় বাবা মহাভারত কিনে দিয়েছিলেন। ছোটদের সংস্করণ, তবে একেবারে ছোট বা সংক্ষিপ্ত ভার্সন নয়। মন দিয়ে পডেছিলাম। অনেককিছই এখন অবশ্য আর মনে নেই। কিন্তু বনপর্বে বকরূপী যক্ষ ও যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নোত্তর পর্বের অধ্যায়টা বেশ মনে আছে! উল্লিখিত প্রশ্নগুলি ছাড়াও আরও অনেক প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরকে করেন যক্ষ। যার সবক'টির সঠিক উত্তর দিয়ে বাকি পান্ডব ভ্রাতাদের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন ধর্মপুত্র!

এই গোটা ঘটনাটা ঘটে যে জলাশয়ের পাশে, যেখান থেকে জল আনতে গিয়ে এক এক করে যক্ষের রোষানলে ভস্মীভূত হয়ে প্রাণ হারান ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব, সেই জায়গাটাই যে দেওরিয়াতাল অর্থাৎ আমার আজকের গন্তব্যস্থল সেটা বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্তও জানা ছিল না! দেওরিয়াতাল" অর্থাৎ দেবতাদের স্নান করার পবিত্র জলাশয়! আজ সেখানেই যাব. অনভিজ্ঞের প্রথম ট্রেকিং সফরের শেষতম লক্ষ্যপরণ করার দিন!

ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম বেজে উঠে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। বেরোব আধ ঘন্টা বাদেই। ব্রাশ করে, ফ্রেশ হয়ে নিয়ে পিঠের ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। বাকিরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বাইরে ভোরের আলো ফোটেনি। কেদারনাথ শৃঙ্গ এখনও ঘুমে অচেতন। চাঁদ আকাশে জ্বলজ্বল করছে। গাড়ি চলতে শুরু করল সারি গ্রামের পথে। অলপ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। পর পর বেশ কয়েকদিন ভোরে ওঠার ফল! ঠিক সকাল সোয়া ছটায় গাড়ি সারি গ্রামে এসে পৌঁছল।

ছোট্ট একটা গ্রাম। বেশ ভাল ঠাণ্ডাই অনুভূত হচ্ছে এখন। একটা ছোট দোকান খোলা রয়েছে যেখানে একজন চা বানাতে ব্যস্ত। বাকি গ্রাম এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। আশেপাশে বেশ কয়েকটা হোম স্টে আর একটু দূরে বেশ বড়সড় তিনতলা একটা হোটেল চোখে পডল। গাডি থেকে নেমে চা দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম যে গাইড পাওয়া যাবে কিনা দেওরিয়াতাল এর জন্য। উনি বললেন, হ্যাঁ পাবেন। একজনকে ফোন করলেন আমার সামনেই। তারপর বললেন, একটু দাঁড়ান চলে আসবে খানিক বাদেই। অপেক্ষা করতে লাগলাম গাডিতে বসেই কারণ বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ভোর প্রায় সাডে ছটা বাজে এখন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বছর বত্রিশ-তেত্রিশের এক সুবেশ, সুদর্শন যুবক এসে দাঁডালেন। আমি ভেবেছিলাম হয়ত গ্রাম্য কোন এক যুবা হয়ত আসবেন। ইনি রীতিমতো কেতাদুরস্ত পোশাকআশাক পরিহিত। মিলিটারি রং-এর জ্যাকেট গায়ে। আলাপ হল – আদতে হরিয়ানার বাসিন্দা, নাম সন্দীপ চাহাল। দক্ষিণামূল্য ধার্য্য হল হাজার টাকা। দরাদরির কোনো জায়গা নেই, যেহেতু আমি একাই টুরিস্ট। আর দূ-তিনজন থাকলে হয়তো কমত। যাইহোক আমি সম্মত হয়ে ওনার সঙ্গেই জুটে গেলাম। ওই দোকান থেকে একটি শক্তপোক্ত লাঠিও যোগাড হল। পাশ দিয়েই উঠে গেছে দেওরিয়াতাল এর সিঁডি। উঠতে শুরু করলাম দুজনে। ঘড়িতে ঠিক পৌনে সাতটা।

এই পথে ঘোড়াও যায়, সিঁড়ির প্রতি ধাপে ধাপে সেই চিহ্ন বিদ্যমান। নিজের পদযুগলের ওপর ভরসা করেই দুগ্গা দুগ্গা বলে যাত্রা শুরু করলাম। শুরুর চড়াই উঠতে প্রথম দিকে সেই তুঙ্গনাথের মতই কষ্ট বোধ হতে লাগল। অন্যদিকে সন্দীপ তরতরিয়ে উঠতে শুরু করেছেন। ওনাকে একটু আস্তে আস্তে উঠতে রিকোয়েস্ট করলাম। সেই ছোট ছোট স্টেপে লাঠি ভর করে চলতে শুরু করলাম। রাস্তা বেশ খাড়াই, আর এবড়োখেবড়ো পাথুরে প্রথম কিছুটা অংশ। তারপর হাঁটা গেলেও তুঙ্গনাথের মত চওড়া ঢালাই রাস্তা নয়! সন্দীপের সঙ্গে এ কথা সে কথা বলা শুরু করলাম। জানা গেল ওনার আসল বাড়ি চঞ্জীগড়। বাবা আর্মি ম্যান ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত। উনি ঘর ছেড়ে এতদুর আছেন, পাহাড়কে ভালবেসে আর অবশ্যই রোজগারের তাগিদে। এখানেই ছোট ট্রাভেল বিজনেস চালান। মূলত বিভিন্ন ট্রেক অ্যারেঞ্জ করেন সারিকে বেস করে। এছাড়া একটা নিজস্ব হোম স্টে খোলারও পরিকল্পনা নিচ্ছেন খুব শিগগিরই। এই গাইডের কাজ রেগুলার করেন না, তবে লোকজন রিকোয়েস্ট করলে ফিরিয়েও দিতে পারেন না।

মোট রাস্তা আমাদের উঠতে হবে আডাই কিলোমিটার। ছোট্ট সরু খাডাই রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে এঁকেবেঁকে।

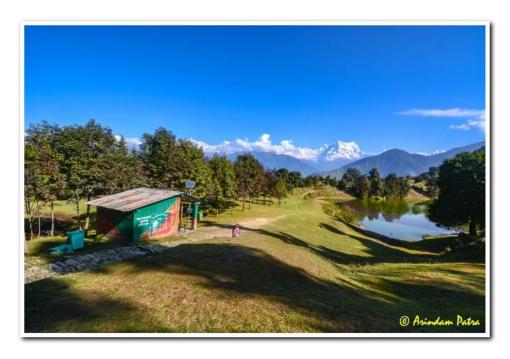
এক একটা বাঁক পিছনে ফেলে ওপরে উঠছি যত, তত নিচে দেখা সারি গ্রামের দৃশ্য ছোট হয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করলাম এই জঙ্গলে হিংস্র বন্য জন্তু থাকে না? উত্তর এল হ্যাঁ স্যার, তা তো থাকেই। মূলত লেপার্ড আর বুনো ভাল্লুক। কিছুদিন আগেই একটা দল নিয়ে এসেছিলেন, রাস্তায় দূর থেকে বুনো ভাল্লুক নজরে আসায় রুট একটু পাল্টে অন্যদিক দিয়ে উঠেছিলেন। কারণ বুনো ভাল্লুক সবচেয়ে ভয়ঙ্কর!! আর একটি ভয়ঙ্কর প্রাণী হল বুনো ভয়োর। তবে আমার সৌভাগ্য এই যাত্রাপথে তেনাদের কারুরই দর্শনলাভ করতে হয়নি।

মাঝেমধ্যেই কপ্ কপ্ করে ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মালপত্র পিঠে বেঁধে ঘোড়া নামছে আর উঠছে বেশ কিছু। শুনলাম ওপরে তালের কাছাকাছি টেন্ট বা হোম স্টেগুলোর দরকারি জিনিসপত্র এমনকি গ্যাস সিলিন্ডারও ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিচু থেকে ওপরে নিয়ে আসা যাওয়া করা হয়।

বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছি। একটা চায়ের দোকান পড়ল। একটু বিশ্রাম নিতে বসলাম। এখানে সবাই সন্দীপের চেনা। উনি দোকান মালিকের সঙ্গে আড্ডা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি একটা স্প্রাইট কিনে একটু গলা ভিজিয়ে নিলাম। অনেকটা নিচে সারি গ্রাম দেখা যাচ্ছে। রোদ উঠে গেছে। বেশ গরম লাগছে। সোয়েটার আর জ্যাকেটগুলো ওই দোকানে রেখেই আবার ওপরে উঠতে শুরু করলাম। সন্দীপ বললেন যে চেষ্টা করতে হবে সকাল সাড়ে আট'টার মধ্যে পৌছে যেতে, নটা পেরিয়ে গেলে তালের চারিদিকের হিমালয়ের শৃক্ষগুলিকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবেনা। মেঘে ঢেকে যেতে পারে। অতএব পা চালাতে হল যতটা সন্তব দ্রুত। উঠতে উঠতে নানান গল্প শুনতে থাকলাম। এই রাস্তা নাকি পাণ্ডবদের বানানো সেই কতকাল আগে!! তারপর সেরকম সংস্কার হয়নি। আমি কৌতৃহলী হয়ে সন্দীপকে জিজ্ঞেস করলাম যে উনি যক্ষ ও যুধিষ্ঠিরের গপ্পটা জানেন কিনা! দেখলাম যে জানেন না। আমি তখন ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। আরও বললাম আপনি পরে টুরিস্টদের এই গল্পটা বলতে পারেন, সবার শুনে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে!

পথেই পড়ল শিব মন্দির, এই মন্দিরের নামও ওমকারেশ্বর মন্দির। সেই এক ধাঁচের, সেই এক গড়ন, তুঙ্গনাথ বা কেদারনাথের স্টাইলের। তবে আপাতত শুধুই ওঠা, নামার সময় এখানে পূজা দিয়ে যাব। আর বেশিদূর নেই, বেশ খানিকটা ওঠার পরে রাস্তার খাড়াই ভাবটা কমে এল। এবারে রাস্তা বেশ সমতল। আশেপাশে বেশ কিছু ছোট ছোট ঘরবাড়ি, দোকানপাট নজরে পড়তে থাকল। সন্দীপ বললেন যে, এখানে যেরকম টেন্টে থাকার ব্যবস্থা আছে সেরকমই ইদানীং বেশ কিছু হোম স্টে'ও খুলেছে। পাকা ঘরবাড়ি, টিনের চাল, ভেতরে খাট, বিছানা, লেপ, কম্বল সমেত। টেন্টে থাকতে বরাবরই অপছন্দ আমার। ইচ্ছা রইল পরে কখনো ফিরে এলে এইসব হোম স্টে'তে এক রাত থাকার!! সন্দীপকে বলাতে উনি বললেন যে সেরকম হলে ওনাকে বললে উনি বন্দোবস্ত করে দেবেন।

এরপর ডান দিকে বেঁকে গাছের ছায়ায় ছায়ায় পথ চলা শুরু করলাম। সামনেই দেওরিয়াতাল। এসে গেছি কাজ্জিত লক্ষ্যে! ঘড়িতে বাজে সোয়া আট'টা অর্থাৎ ঠিক দেড় ঘন্টায় পৌঁছে গেছি। বাঁদিক ঘেঁষে ছোট্ট টিকিট ঘর, দেড়শো টাকার টিকিট কাটতে হল। উত্তরাখণ্ড গভর্ণমেন্ট অল্প ক'দিন আগেই এই টিকিট সিম্টেম চালু করেছেন শুনলাম। আর তালের একদম পাশে টেন্টিং বা ক্যাম্পিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে।



টিকিট কেটে মাথা ঘুরিয়েই মাথাটা ঘুরে গেল!!! একি দেখছি?!! এ তো যেন স্বর্গে এসে পড়েছি! রীতিমতো স্বর্গীয় পরিবেশ!! বিস্তীর্ণ মখমলের মত সবুজ ঘাসে মোড়া বুগিয়াল, দূরে হিমালয়ের শ্বেতশুল্র শৃঙ্গরাজি আর ছোট্ট সুন্দর স্বপ্নের মত টলটলে জলের একটা জলাশয়!!! এই তো সত্যিকারের দেবতাদের স্নান করার জলাশয়! সার্থকনামা "দেওরিয়াতাল"! আশেপাশে টুরিস্ট আজ সেরকম নেই। আমি, সন্দীপ আর আমাদের সঙ্গে জুটেছে এক সারমেয়! ও এখানেই থাকে। সন্দীপ খুব একচোট আদর করল তাকে। তালের দিকে এগিয়ে চললাম দুজনে। হঠাৎ বাঁ দিকে চোখ পড়তেই সন্দীপ আমায় দাঁড় করিয়ে দিল ইশারায়। ওর চোখ অনুসরণ করে দেখি একটা লাল মাথা কাঠঠোকরা পাখি অপেক্ষাকৃত সামান্য উঁচু একটা জায়গায় নিজের খেয়ালে বসে। পথে আসতে আসতে আগেই সন্দীপ বলেছিলেন যে এখানে প্রচুর পাখিও পাওয়া যায় দেখতে, উনি যতটা পারবেন পেলে দেখিয়ে দেবেন!

আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটু নিচু ঢালু জায়গায়। এখান থেকে কাঠঠোকরা মশাই আমাদের চোখের লেভেলেই বিরাজমান।

পা টিপে টিপে অল্প এগিয়ে কয়েকটা শট নিলাম। এর আগে এত কাছ থেকে আমি কখনো পাখির ছবি তুলিনি। ল্যান্ডস্কেপ ছবিই আমার মূল ভালো লাগার জায়গা, আর পাখির ছবি তোলার মত স্কিল বা প্রয়োজনীয় লেন্সও আমার নেই। তাই আজ খুব ভাল লাগল এই স্কেলি বেলিড উডপেকারকে লেন্সবন্দী করতে পেরে। অবশ্য এর একশো শতাংশ কৃতিত্ব প্রাপ্য সন্দীপেরই।



যাই হোক, এরপর এগিয়ে গেলাম আমার স্বপ্নের দেওরিয়াতাল-এর দিকে। জল মোটামুটি স্বচ্ছ, শুনলাম আশেপাশের প্রামের অলপকিছু বাসিন্দা এই জলই ব্যবহার করে থাকেন। তালের পাশে টেন্টিং করার জন্য জল নোংরা হচ্ছিল। তাই সরকারের তরফে আইন করে তা বন্ধ করে দেওরা হয়েছে। সন্দীপ বললেন তাল-এর চারিদিকে পুরোটা প্রদক্ষিণ করাবেন। তার আগে একটু চড়াই উঠে একটা ভিউ পয়েন্টে নিয়ে চললেন। ভিউ পয়েন্ট থেকে দুধ সাদা শিখরগুলিকে প্রাণভরে দেখলাম। সবার মধ্যে ঝকমক করছে মাউন্ট চৌখায়া। ঠিক যেন হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে!! পাশেই প্রায় সাত- আট ফুট উঁচু একটা ওয়াচ টাওয়ার। দুজনে মিলে দস্যি ছেলেদের মত সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লাম সেই টাওয়ারে। উঁচু থেকে আরও পরিক্ষার ভাবে চারিদিক দেখতে পাওয়া যায়। তারপর নেমে এসে তাল প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলাম। আশেপাশে প্রচুর ছোটখাটো ওয়ধির গাছ দেখালেন সন্দীপ যা থেকে আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরি হয়। ছোট ছোট লাল বেরি ফলও দেখলাম। একটু হেঁটে দেওরিয়াতাল-এর আরেকদিকে চলে এলাম। এখান থেকে একদম সুস্পষ্টভাবে মাউন্ট চৌখায়ায় প্রতিবিম্ব জলে পড়তে দেখলাম। যে ছবি ক্যামেরাবন্দী করতে এতদূর আসা!! তবে আরও সকালে এলে বিশেষ করে শীতকালে এই দৃশ্য আরও ভাল ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, যখন তালের জল একদম স্থির থাকে! নির্মেঘ নীল আকাশের বুক চিরে ফটফট করে কেদারনাথ এর কন্টার উড়ে গেল দু-একটা। প্রায় সাড়ে নটা বাজে। অর্থাৎ এক ঘন্টার ওপর সময় পেরিয়ে গেছে। এরপর নামার পালা। সেই সারমেয়টির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। ফেরার সময়েও ফের পিছু নিয়েছে ধর্মরাজের মত! এক প্যাকেট 'পার্লে জি' খাইয়ে আর বেশ আদর করে তবে নিচে নামা শুরু করলাম।

ওমকারেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে ভুললাম না! পূজারীজি সন্দীপের বেশ পরিচিত। মন্দির চত্বরে দুজন বাঙালি যুবকের সঙ্গেও আলাপ হল, ওনারা কেদারনাথ সেরে এসেছেন এখানে। পাশেই ভাঙ বা আফিমের গাছ দেখালেন সন্দীপ বেশ ক'টি। এখানকার মানুষ এই ভাঙ-এর চাটনি খুব ভাল বানান আর খেতেও নাকি সুস্বাদু খুব। সন্দীপ বললেন যে ওনার অ্যারেঞ্জ করা ট্রেকিং ট্রিপে যেমন মদমহেশ্বর বা অন্যান্য ট্রিপে খাদ্যতালিকায় এই ভাঙের চাটনি ইজ এ মাস্ট। সারাদিনের হাঁটার ক্লান্তি ভুলে ঝপ করে ঘুমিয়ে পড়তে খুব সাহায্যকারী।



এসব শুনে খিদে পেয়ে গেল। মনে পড়ল, আজ উখিমঠের হোম স্টে'তে বীর সিং কথা দিয়েছেন চিকেনের বন্দোবস্ত করবেন। যেটা রান্না করবেন আমার অর্ধাঙ্গিনী। শেষ পাতে অবশ্য ভাঙের চাটনি থাকছেনা! পা চালালাম দ্রুত। নিচে নেমে সন্দীপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললাম উখিমঠ। আগামীকাল এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাব দেবপ্রয়াগ!





পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্রের নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।



জাঞ্জিবারের প্রিজন আইল্যান্ড ও স্লেভ মেমোরিয়্যাল

অতীন চক্রবর্তী

২০১৯-এর নভেম্বরের প্রথমদিকে পূর্বআফ্রিকার তানজানিয়া (Tanzania) রাষ্ট্রে ভারত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে অবস্থিত প্রাচীন শহর দার এস সালাম-এর মাটিতে পা রাখার সৌভাগ্য হয়েছিল। দার এস সালাম (Dar es Salaam) আরবী শব্দ, যার অর্থ হল 'স্বর্গের শান্তি'। প্রায় তিনমাস প্রতিদিনই আনন্দ করে তানজানিয়ার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। ঘুরেছি নানা শহর, দ্বীপ, বন জঙ্গল, সমুদ্রের গা-ঘেঁষা প্রাচীন গ্রাম্যজীবনের মাঝে। পেয়েছি বিদেশি বণিকদের অত্যাচারে জর্জরিত তানজানিয়ার আদিমযুগের জনবসতির জীবনযাত্রার পরিচয়। মেতেছি মাসাইজাতির নাচগানের সঙ্গে। মাসাই ছাড়া তানজানিয়া রাজ্যে জনসংখ্যার বেশিরভাগ হেহে, বেনা, চাগু, নগোনি, কিং গ্রুপস, বারবৈগরার ইত্যাদি আদিবাসীরা। আশ্র্যজনক নীল আকাশের নীচে সমুদ্রেঘেরা গাছপালায় সাজানো তানজানিয়া বা জাঞ্জিবারের মতো শহরগুলো দেখে সত্যি মনে এনে দিয়েছে অফুরস্ত তুপ্তি।

তানজানিয়া বা জাঞ্জিবারের প্রাচীন ইতিহাসের পুরানো পাতা উল্টালে জানা যাবে আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে একসময় এদেশে এসেছিল। অন্য ব্যবসার পাশাপাশি গরীব আদিবাসীদের দাস হিসাবে বিক্রয় করা ছিল এদের ব্যবসার একটি প্রধান উপকরণ। এখানকার ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডা গামা প্রথম ইউরোপিয়ান যিনি ইস্ট আফ্রিকার সমুদ্রতটে পদার্পণ করেছিলেন। ১৫২৫ সালের মধ্যে পর্তুগিজরা পুরো উপকূলেই বসবাস শুরু করে। ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ওমান থেকে আরবিরা এসে উপস্থিত হয় এদিকে। জাঞ্জিবার (Zanzibar) হচ্ছে দার এস সালাম-এর গাঘেঁষা দ্বীপময় একটি অঞ্চল, ওমানি সুলতান সৈয়িদ সইদ ১৮৪০ সালে তাকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন। এরপর মজিদ বিন সৈয়িদ (১৮৩৪-১৮৭০) দার এস সালামকে স্বর্গের শান্তি রূপে সাজিয়ে তোলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা দার এস সালামের উপর অধিকার নেয়, যদিও বাকী পুর্বআফ্রিকা এসে যায় জার্মানদের হাতে, নাম দেয় 'তাংগানিকা' (Tanganyika)। দার এস সালাম ছিল তখনকার দিনে এদের রাজধানী। তাংগানিকা স্বাধীন হয় ১৯৬১ সালে, তাঙ্গানিকা আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (TANU)-এর ডাকা উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে। এরপর ১৯৬৪ সালে তাংগানিকা আর জাঞ্জিবার একত্রিত হয়ে নাম নেয় 'সংযুক্ত তানজানিয়া যুক্তরাষ্ট্র' (United Republic of Tanzania)। পরে অবশ্য রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ডোডোমাতে ১৯৭৩ সালে। আজ জাঞ্জিবার সংযুক্ত তানজানিয়া যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বয়ংশাসিত অঞ্চল - ভ্রমণপিপাস পর্যটকদের কাছে স্বর্গভ্রিয়

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দার এস সালাম থেকে বেরিয়ে পড়লাম জাঞ্জিবারের দ্বীপে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার জন্য। দার এস সালাম থেকে জাঞ্জিবারে যেতে হয় আকাশপথে নতুবা সমুদ্রপথে। বিমানে সময় নেয় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ। তবে চলন্ত বোট থেকে সমুদ্রের রূপ সত্যি উপভোগ করার মতো। আজাম মেরিন কোম্পানির(Azam Marine Co.) ফাস্ট ফেরি সার্ভিসের বিজনেস ক্লাসের তিনটে টিকিট বিকেল চারটের বোটের জন্য অনলাইনে আগেই বুক করে নিয়েছিলাম। বোটের ভেতরটা অপূর্বভাবে সাজানো। ওয়াশিংকম, কফিস্টল সবকিছুই রয়েছে। চারপাশে ইউরোপিয়ান পর্যটকদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। সবাই সমুদ্রের রূপ দেখতে ব্যস্ত। ভারত মহাসাগরের সবুজ জলের ওপর ভেসে চলেছে নানা রঙের বোট বা বড় বড় জাহাজ। জলের ওপর পড়ন্ত সূর্যের আলাদা একটা রূপ দেখবার লোভ নিয়ে চলে এলাম বোটের শেষপ্রান্তের ডেকের দিকে। না এলে হয়তো পরে আফসোস করতে হত। এ দৃশ্য শুধু উপভোগ করা যায়, বর্ণনায় প্রকাশ করা যায়না। আকাশপথে পর্যটকরা এ আনন্দ কোনোদিনই উপলব্ধি করতে পারবেন না।





সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় এসে নেমেছিলাম জাঞ্জিবার বন্দরে। নিয়মকানুনের পালা শেষ করে বন্দরের কাছে আমাদের 'হোটেল মিজিঙ্গানি সি ফ্রন্ট'-এ এসে পৌঁছতে প্রায় সাড়ে সাতটা হয়ে গেল। হোটেল নয়তো যেন কোন সুলতানি আমলের প্যালেস। নির্ধারিত ঘরটি সাজানো রয়েছে অপূর্ব রাজকীয় পালস্ক, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, ঘড়ির মতো নানান মূল্যবান আসবাবপত্রে। পরে জানতে পেরেছিলাম ১৮৬৫ সালে এই ঐতিহাসিক প্রাসাদ বানানো হয়েছিল রাজকীয় নবদম্পতিদের থাকার জন্য। ১৯২৮ সালে এটিকে কাস্টম হাউস হিসাবে নেওয়া হয়েছিল। এরপর একসময় একে হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়। ভাবতে ভালোই লাগছে এই বিদেশে অন্তত তিন-চারদিন সূলতানি মেজাজে থেকে যেতে পারব।

চা খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম সান্ধ্যভ্রমণে। রাত আটটা এখানে সন্ধ্যা বলা চলে, ভারতে এখন রাত সাড়ে দশটা। রাস্তার একদিকে সমুদ্র অপর দিকে জনবসতি। হোটেল থেকে বেরিয়ে চোখে পড়বে সুলতান প্যালেস মিউজিয়াম আর হাউস অফ ওয়ান্ডারস। আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পোঁছে গেলাম ফোরধানী ফুড মার্কেটে। সারি সারি খাবারের স্টল। খোলা আকাশের নিচে চেয়ার-টেবিলে বসে গলপগুজবে ব্যস্ত স্বদেশি-বিদেশি লোকজন। ক্রেতা-বিক্রেতা মিলে জায়গাটাকে জমজমাট করে রেখেছে। একটু আগেই এখানে বসে অনেকে পশ্চিম আকাশের সূর্যাস্ত উপভোগ করেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফোরধানী ফুড মার্কেটে এই ব্যস্ততার দৃশ্য চোখে পড়বে। জাঞ্জিবারে এসে সন্ধ্যায় এখানে না এলে জাঞ্জিবার ভ্রমণ যে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে! নানা রকম সী-ফুড, রোম্টেড বা গ্রিলড কিংফিস, চ্যাংগুফিস, লবস্টার, অক্টোপাশ, স্কুইড, কাঁকড়া ইত্যাদি খাদ্য-সরঞ্জামে স্টল সাজানো। রয়েছে নানারকম ঠাণ্ডা পানীয় বা বিভিন্ন ফলের জুস। এরা জুসকে বলে জুসি।

ঘন্টা দুয়েকের মতো ওখানে সময় কাটিয়ে, নৈশভোজন শেষ করে তৃপ্তমনে হোটেলে ফিরে এলাম। সমুদ্রের পাশ দিয়ে হোটেলে ফেরার রাস্তা। এই দিকটা হল জাঞ্জিবারের 'স্টোন টাউন' এরিয়া। জাঞ্জিবারের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায় কতো পুরানো স্মৃতি বহন করে চলেছে এই স্টোন টাউন। জাঞ্জিবার শব্দটা এসেছে আরবি শব্দ থেকে। 'Zanzibar' শব্দটা পরে পাশীয়ান শব্দ 'Zangbar' এ পরিণত হয়। 'Zang' অর্থ কালো আর 'bar' হোল কোস্ট বা ল্যান্ড। অর্থাৎ ল্যান্ড অব ব্ল্যাকস (land of the blacks) বা কালো চামড়ার দেশ।

সমুদ্রের বুকে কতোগুলো দ্বীপ নিয়ে গড়া জাঞ্জিবার রাজ্য। আজ থেকে প্রায় কুড়ি হাজার বছর আগের মানুষদের প্রভাব ছিল এইসব অঞ্চলে। তখন ওরা পাথরের অস্ত্র বানিয়ে ব্যবহার করত। এই দ্বীপ সম্বন্ধে প্রথম জানা যায় গ্রীকদেশের একজন বিণিক-নাবিকের প্রাচীন লেখা থেকে। সেটা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকের কথা। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় এই অঞ্চলের লোকেরা আকৃতিতে খুবই লম্বা প্রকৃতির। উনগুজা, পেম্বার মত কতগুলো দ্বীপ নিয়ে তখনকার জাঞ্জিবার রাজ্য - উনগুজা ছিল রাজধানী। আর ঐতিহাসিক স্টোনটাউন ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আজ এই স্টোনটাউনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রূপে গণ্য করা হয়েছে। প্রথম দিকে এইটি পার্শি প্রভাবে প্রভাবিত হলেও দুশো বছর পরে (১৫০৩ থেকে ১৭২৬) চলে আসে পর্তুগিজ প্রভাবে। এরপর আসে আরবদের হাতে। তাদের সময় প্রকৃত উন্নতি হয়েছিল এই রাজ্যের। বিশেষ করে ওমানি সুলতান সৈয়িদ সইদের রাজত্বকালে। জাঞ্জিবারকে ইস্ট আফ্রিকার রাজধানী বলে মানা হল। শিল্প ও আর্থিক দিকের উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। এখান থেকে জায়ফল, দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, নানারকম মশলার ব্যবসা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় ছিল ব্যবসার একটি প্রধান অঙ্গ। অকথ্য অত্যাচারের মধ্যে চলত তাদের 'ম্লেভ ট্রেড'। কলঙ্কিত তাদের সেই ইতিহাসের কিছুটা সাক্ষী 'প্রিজন্ আইল্যান্ড' ও 'ম্লেভ মেমোরিয়্যাল'। ৮ ডিসেম্বর সেই দ্বীপে যাবার আগের দিনে অবশ্যই দেখব এখানকার একটা স্পাইস গার্ডেন আর সুলতান প্যালেস মিউজিয়াম। সমুদ্রের ঢেউগুলোর পাডে ভেঙে পডার শব্দ শুনতে শুনতে প্রথম রাতে কখন যে নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পডেছিলাম মনে নেই। পাখির

ভাকে পরের দিন ঘুম থেকে উঠে স্পাইস গার্ডেন যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। কিন্তু মনটা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে আগামী কালের 'প্রিজন্ আইল্যান্ড' যাবার স্পিডবোট জার্নির জন্য।





গতকাল স্পাইস গার্ডেন আর প্যালেস মিউজিয়ামে পুরোদিন কাটিয়ে ছিলাম। সঙ্গে ছিল এখানকার ট্যুর প্রোগ্রামে প্রতিদিনের গাইড ফাতেমা। স্পাইস গার্ডেনে শিক্ষিত এই গাইডের গাছ-গাছড়ার ওপর বিশেষ দক্ষতা দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। আজ আবার সকাল সকাল চলে এসেছে প্রিজন আইল্যান্ডে নিয়ে যাবার জন্য। জানতে পারলাম একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা হোটেলের বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁর গাইড আসেনি, তাই আমাদের সঙ্গে প্রিজন আইল্যান্ডে যাওয়ার অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছেন। ওঁকে নিয়ে ফাতেমার সঙ্গে স্টোন টাউনের সমুদ্রের পারের দিকে এগিয়ে চললাম। পুরো বোট ফাতেমা আমাদের জন্য বুক করে রেখেছে। উঠে পড়তেই বোট চলতে লাগল ভারত মহাসাগরের বুকে। কখনো দূলছে, কখনো স্থিরগতিতে জলে তরঙ্গ সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। চোখে পড়ল জলের ওপর বড়ো বড়ো জাহাজ - কেউ চলেছে, কেউবা নোঙ্গর দিয়ে ভেসে রয়েছে। মাঝে মাঝে মাছ ধরার নৌকা ভাসতে দেখা যাছে। ফাতেমা ইতিমধ্যে আমাদের জন্য আনা টিফিন দিয়ে আপ্যায়ন করল। আ্যানি প্রথমে আমাদের খাবার থেকে শেয়ার করতে চায়নি, পরে শুধু জুস নিয়ে ধন্যবাদ জানাল। হাসি-খুশি, মিষ্টি ব্যবহার এই আমেরিকান মেয়েটির। অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে আপন করে নিয়েছিল। ফাতেমা দ্বীপটাকে বোট থেকে দেখাতে দেখাতে জানাল দ্বীপটি ৮০০ মিটার লম্বা আর সবথেকে চওড়া অংশ হচ্ছে ২৩০ মিটার। ক্রীতদাসদের এখানে এনে রেখে পরে বেচা-কেনা হত। সেসব প্রায় ১৮৬০

সালের কথা। এছাড়া এই দ্বীপে ছিল উন্নত ধরণের কোরাল মাইনস। ১৮৬০ সালে এই জঙ্গলময় জনবসতিশূন্য দ্বীপটিকে জাঞ্জিবারের সুলতান মজিদ বিন সৈয়িদ দুজন আরবকে ক্রীতদাসদের বন্দী করে রাখার জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এখানে অমানুষিক অত্যাচার হত তাদের ওপর। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে জাঞ্জিবারের প্রথম ব্রিটিশ মন্ত্রী লয়েড ম্যাথিউজ এই দ্বীপটি কিনেছিলেন এবং একটি জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। সেই সময় 'ইয়েলো ফিভার'-এর ঝামেলায় দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল জাঞ্জিবারের শাসনকর্তারা। তাই বন্দীর বদলে তখন তাঁরা দ্বীপটিকে ইয়েলো ফিভারের কোয়ারানটাইন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। সেই সময় থেকে এই দ্বীপে আর কোনও বন্দী রাখা হয়নি। ১৮৯৪ সালে বন্দীশালার পুরো বিল্ডিংটার নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। এরপর দ্বীপটি ইউরোপিয়ান এবং জাঞ্জিবারের স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য একটি জনপ্রিয় অবসরস্থল হয়ে উঠেছিল। 'ইউরোপিয়ান বাংলো' নামে পরিচিত ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৮৯০-এর দশকের শেষদিকে। সম্প্রতি দ্বীপটি সরকারি মালিকানাধীন একটি ট্যুরিস্ট রিসর্টে পরিণত হয়েছে।



এইসব গলপ শুনতে শুনতে একসময় আমরা দ্বীপটার কাছাকাছি এসে গেলাম। আধ ঘন্টার মতো এই বোটজার্নি সতি্য মনে রাখার মতো। সাগরের বুকে বসে দ্বীপের শোভা অপূর্ব লেগেছিল দেখতে। ছোট-বড় গাছ দ্বীপটাকে সবুজ করে রেখেছে। বাঁদিকে বিশাল লম্বা একটি জেটি সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে এগিয়ে গিয়েছে। ভালোভাবে রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার ওপরে পর্যটকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মন্থরগতিতে কচ্ছপগুলো চলাফেরা করতে ব্যস্ত। ফাতেমা জানালো - সেইচেলেস (Seychelles)-এর ব্রিটিশ গভর্ণর এই দ্বীপকে একসময় উপহার হিসাবে কয়েকটি অ্যালডেবরা জায়ান্ট টরটোইজ (Aldabra giant tortoises) দিয়েছিলেন। তাদেরই বংশজাত অনেক কচ্ছপ আজ পর্যটকদের আনন্দের খোরাক। এদের মধ্যে কারো কারো বয়স প্রায় দুশো বছরের মতো। কিছুটা ডান দিকে চলে এলে একটা খাদের ভেতর রয়েছে ওদের ডিম পাড়ার নির্ধারিত স্থান। কয়েকটা কচ্ছপ ওখানে তখনও রয়েছে। কচ্ছপের বড়ো বড়ো ডিম দেখলাম।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা এগিয়ে গেছে ট্যুরিস্ট রিসর্টের দিকে। চলতে চলতে অনেক ময়ূর চোখে পড়ল। কেউ ঝোপের ভেতর, কেউবা রাস্তার আশে-পাশে। এই জঙ্গলে

রয়েছে 'ডিক্-ডিক্' নামে খুব ছোটজাতের চঞ্চল একপ্রকার হরিণ। দেখবার লোভে জঙ্গলের একটু ভেতরের দিকে এগিয়ে চললাম। এই জাতের হরিণ আজকাল প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। শুধু ইস্ট আর সাউথ আফ্রিকাতে কিছু দেখা যায়। বেশ কয়েকটা 'ডিক্-ডিক্'কে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল কারো কারো।



এরপর চলে এলাম এককালের বন্দীশালায়, যার জন্য এই দ্বীপকে বলা হয় 'প্রিজন আইল্যান্ড'। পুরোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। বিশাল চত্ত্বরের পাশ ধরে সারি সারি ঘরগুলাের বেশিরভাগই এখন বন্ধ রয়েছে। বিশ্রাম ঘর হিসাবে এগুলাে ব্যবহার হয়। ভেতরে বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। দেওয়ালের একদিকে রয়েছে সমুদ্রের দিকে যাওয়ার সিঁড়ি। এই স্থান দিয়েই ক্রীতদাসদের নিয়ে বােটে ওঠা-নামা ছিল সেই সময়। আজকের দিনে ওপর থেকে সমুদ্রের শােভা উপভােগ করে পর্যটকদের মন তৃপ্তিতে ভরে যায়, কিন্তু এমন দিনও ছিল যেদিন ক্রীতদাসদের এই ব্যথা-বেদনার অশ্রুজলে ভরে গিয়েছিল এই মর্মর চত্ত্বর। চাবুকের ঘায়ে রক্ত ঝরেছিল তাদের শরীর থেকে। কলঙ্কিত সেই অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজও বয়ে চলেছে ভারত মহাসাগর। ঢেউগুলাে যেন বারবার ছুটে আসছে আধুনিক সভ্য জগতকে তাদের নীরব ভাষায় সেই বেদনার বার্তা জানাতে। পাড়ের কাছে এসে দুঃখে ভেঙে পড়ে ওরা বারবার।



মনটা সত্যি বিষাদে ভরে গেল এখানে এসে এইসব ইতিহাসের কাহিনি শুনে। নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম ফাতেমার সঙ্গে দ্বীপের আরেক প্রান্তের দিকে। অ্যানী কৌতূহলী হয়ে এই দ্বীপের আগের নাম কি ছিল জানতে চাইল। ফাতেমার থেকে জানতে পারলাম একসময় এই দ্বীপের নাম রাখা হয়েছিল কোয়ারেন্টাইন বা প্রিজন আইল্যান্ড, কিন্তু কিছু পুরানো মানচিত্রে এই দ্বীপকে "কিবান্ডিকো দ্বীপ" হিসাবে দেখানো হয়েছে, যদিও এই নামটি আর ব্যবহার হয়না। একধরণের মাছ এই দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রের জলে প্রচুর দেখা যায়, সোয়াহিলি ভাষায় মাছটার নাম 'চ্যাঙ্গ্ব'। সেই কারণে জাঞ্জিবারের স্টোন টাউন থেকে ৫-৬ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই দ্বীপের আরেকটি নাম হয়েছিল 'চ্যাঙ্গু দ্বীপা'।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় দ্বীপের শেষপ্রান্তে অবস্থিত জেটিটার উপর উঠে পড়লাম। অনেকটা লম্বা-চওড়া, রেলিংএ ঘেরা সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে জেটির বেশিরভাগ অংশ। অনেক পর্যটক তখন এই জেটির ওপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের শোভা দেখতে ব্যস্ত। জলেতে ঝাঁকে ঝাঁকে চ্যাঙ্গু মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। মাছগুলোর জন্য অনেক জায়গায় জলটা কালো দেখাচ্ছে। অনেকটা তেলাপিয়া মাছের মতো দেখতে। জেটির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সবুজ এই দ্বীপের রমণীয় দৃশ্য সত্যি মনে এনে দেয় এক অফুরন্ত তৃপ্তি।

এবার আমাদের যেতে হবে মেন ল্যান্ডের 'স্লেভ মেমোরিয়্যাল' কমপ্লেক্সের অঞ্চলে। বিদায় চ্যাঙ্গু দ্বীপ — বিদায় প্রিজন আইল্যান্ড – বিদায়।

আবার স্টোন টাউনে ফিরে এলাম প্রিজন আইল্যান্ড থেকে। ফোরোধনী গার্ডেনের পাশ দিয়ে চললাম 'ম্লেভ মেমোরিয়্যাল' কমপ্লেক্সের উদ্দেশ্যে। ১৯৩৬ সালে সুলতান খালিফা সিলভার জুবিলি উৎসবের অনুষ্ঠান করবার জন্য এই ফোরোধনী গার্ডেনের উদ্বোধন করেন। দিনের বেলায় এখানে এলে বোঝাই যাবে না যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় লোক আর পর্যটকরা মিলে কী রকম উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করে। নানা



ধরণের খাবারের দোকান, হকারদের কোলাহলের পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় ছোটদের বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলোর আয়োজন। এরই কাছে রয়েছে ইস্টআফ্রিকায় অবস্থিত আরবদের প্রাচীনতম দুর্গ।



১৬৯৮ সালে আরবরা এখানে এসে পর্তুগিজদের ছোউ একটি ধর্মীয় স্থানের উপরই এই ফোর্ট নির্মাণ করেন। স্টোন টাউনের ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইটের মধ্যে এইটিও গণ্য। এর সঙ্গে রয়েছে কালচারাল আর্ট গ্যালারি। ঘুরতে ঘুরতে একসময় চলে এলাম ইস্ট আফ্রিকা স্লেভ ট্রেড এক্সিবিট- এর হলঘরে। যারা ভেতরে ঢুকেছি বেশিরভাগই বিদেশি। বিদেশিদের টিকিটমূল্য অনেক বেশি ধার্য করা হয়েছে। হলঘরটা ভরে রয়েছে অত্যাচারের ইতিহাস নিয়ে নানা কাহিনিতে। ক্রীতদাসদের উপর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা নানা ছবিসহ তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ মানুষের ওপর এত মর্মান্তিক অত্যাচার

করতে পারে এখানকার ছবিগুলো না দেখলে তা বিশ্বাস হত না। নির্মম অত্যাচারের প্রকাশক ছবিগুলো, বিষাদের ছবি। এত পর্যটিক ভেতরে রয়েছে, কিন্তু সবাই নির্বাক। এ পাপের কোন ক্ষমা নেই ভগবানের দরবারে।



হলঘরের পাশেই রয়েছে স্লেভ চেম্বার। বলতে গেলে আলোবাতাসবিহীন সরু একটা টানেল। সেখানেও তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত, তারপর সুবিধামত খরিদ্দার পেলে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হত। ক্রীতদাস কেনা-বেচা ছিল তখনকার দিনের আয়ের একটা বড় পথ। চেম্বারে ঢুকে মনটা বিষাদে ভারাক্লান্ত হয়ে গেল। নামমাত্র আলোবাতাসের ভেতর কী করে মানুষ দিনের পর দিন থাকত ভাবতেই পারা যায় না। অত্যাচারের নমুনা জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে একটি স্লেভ মেমোরিয়াল। বড় আয়তনের একটি চৌবাচ্চার মতো গর্ত, ভূমিতলের কিছুটা নিচে, তৈরি করে তাতে রাখা আছে অসহায় ক্রীতদাসদের স্ট্যাটু। ঘাড়ে পরানো আছে লোহার কলার যাতে বাঁধা থাকত শিকল। করুণ এই দৃশ্য কতক্ষণ আর দেখা যায়!



এই স্লেভ চেম্বারের কাছেই রয়েছে আফ্রিকার প্রথম অ্যাংলিকান ক্যাথিড্রাল ক্রাইস্ট চার্চ (Anglican Cathedral Christ church) — এককালের ক্রীতদাস কেনা-বেচা বাজারের জায়গাতেই ইউনিভার্সিটিজ মিসন টু সেন্ট্রাল আফ্রিকা (UMCA) তৈরি করেছিল এই চার্চ। উঠিয়ে দিয়েছিল সেই কুখ্যাত বাজার। এখানের বেদিটা মনে করিয়ে দেয় সেই গাছের কথা যাতে বেঁধে ক্রীতদাসদের চাবুক মারা হত। বৃত্তাকার সাদা পাথরের চারপাশে লাল রং দিয়ে ঘেরা — ক্রীতদাসদের রক্তের প্রতীক, তাদের জীবনের দুঃখময় দীর্ঘশ্বাসের প্রতীক। বিশপ স্টিভের তত্ত্বাবধানে এবং একান্ত চেষ্টায় এই চার্চটি গড়ে উঠেছিল। তাঁর বন্ধু এম.এফ. হেউওন চার্চটির লে-আউট ড্রইং করে দিয়েছিলেন।



এদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচারে মিশনারি ডাক্তার লিভিংস্টোনের অবদান সারণীয়। চার্চের বাঁদিকের দেওয়ালে একটি ক্রশ বসানো আছে। সেটি তৈরি হয়েছিল চিতাম্বো গ্রামের একটি গাছের ডাল থেকে, যে গাছের নীচে লিভিংস্টোনের হৃৎপিন্ডকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। বিষণ্ন মনটা চার্চের নীরবতায় দাঁড়িয়ে কিছুটা শান্তি পেল। তবু তারি মাঝে সেই শিকলে বাঁধা অসহায় মানুষগুলোর মুখ বারবার ভেসে উঠছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে কখন যে হোটেলে পৌঁছে গিয়েছিলাম মনে নেই। একসময় হঠাৎ মনে পড়ল জাঞ্জিবারের বোটম্যানের কথা, বোট থেকে নামবার সময় সে আমাদের সোয়াহিলি ভাষায় জানিয়েছিল, "রোহো সাফি না মাপেনঞ্জি" অর্থাৎ ক্লিন হার্ট অ্যান্ড লাভ ফর এভরিওয়ান।





অবিভক্ত ভারতের রাজশাহী জেলার নওগাঁতে জন্ম অতীন চক্রবর্তীর। সরকারি পেশা এবং ভ্রমণের নেশার টানে ঘুরেছেন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লিখছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কারও।

কেমন লাগল : - select - 🗸 🗸

মত দিয়েছেন : গড় : 0.00 Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন



হল =

পরিত্যক্ত মন্দিরের দেশ কাম্বোডিয়া

মল্যু সরকার

অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম কোথায় যাই কোথায় যাই। সেই কবে আমেরিকা থেকে এসেছি তারপর দেশের বাইরে আর যাওয়া হয়নি। দেশের বাইরে বলেই নয়, দেশের মধ্যেও অনেক জায়গা আছে যা আমার দেখা হয়নি। যখন মনে হল, টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি কাছাকাছি কোন টিকিট নেই, সব একমাস পর। এদিকে গিন্নি, মেয়ে সব ঝোঁক ধরেছে কোথাও একটা চল। শেষমেশ ওদের বললাম, এই বর্ষায় দার্জিলিং-এর কোনো গ্রামে গিয়ে বসে পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে চুপচাপ বর্ষা উপভোগ করব — একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। এই বলে কাউকে আর কোন সুযোগ না দিয়ে ঝট করে দেখলাম, টিকিট পাওয়া যাচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ির, কেটে নিলাম। তারপর আলোচনা শুরু হল - কোথায় যাব কোথায় থাকব এইসব। বন্ধুরা বলে এই বর্ষায় দার্জিলিং যাচ্ছ, কোথায় ধ্বস নামবে আটকে পড়বে। সব কবিগিরি তখন বেরিয়ে যাবে — বর্ষায় পাহাড়ের কবিত্ব করা বুঝবে তখন। ছেলে রাতে শুনে বলে, সত্যিই তো, এখন দার্জিলিং যাচছ! এক কাজ কর, তোমরা আমাকে আজকের রাতটা সময় দাও, একটু ভেবে দেখছি।

পরদিন সকালে বলে, তোমরা সুটকেশ গুছোও, টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছি ই-মেলে। সে কী, কোথাকার টিকিট? আর আমি যে এত টাকার টিকিট কাটলাম!

- যাচ্ছ, কাম্বোডিয়া।
- কাম্বোডিয়া? আঁতকে উঠি আমি। কোথায় দার্জিলিং আর কোথায় কাম্বোডিয়া!
- টিকিট ক্যানসেল করে দাও। যা কাটে, কাটবে। আমি টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছি, হোটেলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি খালি একটু পড়াশোনা করে নাও কোথায় থাকবে, কী কী দেখবে, জায়গাটার সম্বন্ধে একটু ভাল করে নোট করে নাও। বুঝলাম ছেলে যখন বলেছে, তখন যেতেই হবে। ওর জেদের কাছে হার মানতেই হবে।

কদিন ধরে চলল একটু লেখা পড়া, ইতিহাস ভূগোল তো শুধু নয়, বর্তমান টাকার দাম, যানবাহন, ব্যবসা বাণিজ্য, ট্যাক্সি রিক্সা, দেখার জায়গা, কীভাবে যাব, কোথায় থাকব, কী খাব, কোথায় খাব, এমন কী টয়লেট-এর কী ব্যবস্থা সেটা পর্যন্তও, কারণ, আমি দেখেছি, টয়লেটের ব্যবস্থা এক এক জায়গায় এক একরকম। সব জায়গাতেই একই রকম নয়। জানা না থাকলে অসুবিধায় পড়তে হয়।

মেয়ে আর গিন্ধি তো লাফিয়ে উঠল। খাতা পত্র নিয়ে বসলাম — ডিজিটাল, পেপার দুভাবেই নোট করতে লাগলাম। এবার ছেলে বলল, টিকিট পাঠিয়েছি এয়ার এশিয়াতে যাওয়া, আসাও তাই। এয়ার এশিয়ার নামে আমার একটু বিতৃষ্ণা আছে। ওদের ফ্লাইটে একটু জলও দেয় না, আর মালের সাত কেজির ব্যাপারে এতই কড়া, যে অন্য কারোর সঙ্গে তুলনা হয় না। ছেলেকে বললাম বাড়তি লাগেজের কিছু ব্যবস্থা রেখো। ও বলল, তোমার বলার আগেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছি, বাড়তি পঁচিশ কেজির একটা ব্যাগ নিতে পারবে। ওদের ব্যাপারে গত ট্যুরে ব্যাংকক থেকে আসার সময় কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবার আর সেটার পুনরার্ত্তি চাই না।

যাক মালপত্র ওজন করে মেপে আমরা তৈরি। রাত এগারোটার মধ্যে এয়ারপোর্টে হাজির। সব নির্বাপ্থাটে মিটে গেলে কিছুক্ষণ বসে প্লেনে ব্যাংককের ডি মুয়াং এয়ারপোর্টে পৌঁছানো গেল। সেখান থেকে আবার প্লেনে সিয়েম রিপ এয়ারপোর্টে নামলাম। ছোট এয়ারপোর্ট -আমাদের ডিব্রুগড় কী জোড়হাটের মত। হেঁটে বেরোতে গিয়ে প্রথমেই পড়ল ভিসা কাউন্টার। ওরা জনপ্রতি তিরিশ ডলার আর একটা ফটো চাইল পাশপোর্টের সঙ্গে। কোন প্রশ্ন নয়, সময় নেওয়া নয়, ঠিক পাঁচ মিনিটও বোধ হয় লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে ভিসা হয়ে গেল। আমি যত দেশ ঘুরেছি সব চেয়ে কম সময় বোধ হয় এখানেই নিল। অবশ্য এক হাজার টাকা বাডতি দিলে ব্যাংককেও তাডাতাডি হয়।

উল্টোদিকেই ইমিগ্রেশন। সেখানে এক মিনিট, ব্যস, কাজ শেষ। বাইরে বেরিয়ে দেখি নাম লেখা কাগজ নিয়ে অনেকেই দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে আমাদের টুকটুক ড্রাইভারও ছিল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। ছোট এয়ারপোর্ট, আংকোরভাট-এর জন্যই তৈরি। বেরিয়ে রাস্তা দেখে মনে হল ভারতেরই কোনো মফস্বল শহরে নেমেছি। চারপাশে গাছপালা, মানুষজন, দোকানপাট রাস্তাঘাট - যেন মনে হল বাঁকুড়া বা বর্ধমানের কোথাও এসেছি।

হোটেলে পৌঁছানো গেল - নাম ট্রাভেলহোম আংকোর। রিসেপশনিস্ট ছেলেটি খুব ভদ্র। নাম বলল, মং। এরা আমাদের



মতোই দুহাত জোড় করে অভিবাদন করে। প্রথমেই কুশল প্রশ্ন সঙ্গে একটি প্লেটেকিছু ফলের টুকরো ও নরম পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করল। এর আগে অনেক জায়গার হোটেলে গিয়েছি, কিন্তু কোথাও এরকম অভ্যর্থনা পাইনি। হোটেলে পৌঁছাতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সকালটা খেয়ে ঘুমিয়ে কাটালাম।

ঘরটি বেশ। তবে তেতলায়। সবথেকে আশ্চর্য লাগল এদের সিঁড়ি দেখে। সিঁড়িগুলো বেশ খাড়াই আর পা ফেলার জায়গাটা একটা পায়ের যতটা স্বাভাবিকভাবে জায়গা লাগে তার অর্ধেক। ভাবলাম, এদের জায়গা কম, তাই হয়তো এভাবে করেছে। পরে দেখি শুধু এদের নয়, বেশিরভাগ ঘর আর হোটেলেই এই রকম সিঁড়ি। এর রহস্য পরে বুঝেছি। আংকোরভাট মন্দির বা অন্য অনেক মন্দিরের একই রকম সিঁডি। এই নিয়ে পরে বলার ইচ্ছা রইল।

হোটেলে বেশি লোকজন দেখলাম না। ম্যানেজার ছেলেটিকে বললাম, ঘুরতে যাব, ব্যবস্থা কর। টুকটুকেই যাব। টুকটুক হল একটা হোন্ডা (বেশিরভাগই তাই) বাইকের পিছনে বসার জায়গাটি বাদ দিয়ে সেখানে একটি একা ঘোড়ার গাড়ির পিছন দিকটা বা বসার অংশটা জোড়া, অর্থাৎ একা গাড়িই কেবল ঘোড়ার বদলে হোণ্ডা বাইক টানছে। মুখোমুখি চারজন বসতে পারে ভালভাবে।



এদের কারেন্সি রিয়েল এবং আমেরিকান ডলার সমান তালে চলে। এক ডলারের মোটামুটি দাম ধরছে চার হাজার রিয়েল। এবার ধরা যাক,যদি কোথাও আড়াই ডলার দিতে হয় ওরা দেবে বা নেবে দুই ডলার দুহাজার রিয়েল বা দশ হাজার রিয়েল বা সমপরিমাণ মুদ্রা। অর্থাৎ একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে চলে। তবে মনে হল বিদেশিদের কাছে ডলারটাই বেশি চায়। যাই হোক, ওদের নির্ধারিত রেট দেখাল, মোটামুটি দিনপ্রতি পনের ডলার। আংকোরথোমকে ওরা দুভাগে ভাগ করে দুদিনে দেখাছে। একটা ছোট বৃত্ত, একটা বড় বৃত্ত। ছোট বৃত্তের মধ্যে আছে আংকোরভাট, বায়োন মন্দির, টা কেও, টা প্রম, বাস্তে কড়েই, এবং তার উলটোদিকে রাজকীয় স্লানের দিঘি - শ্রাস শ্রাং; তা এতে যত সময়ই লাগুক। তবে মোটামুটি দেখলাম, যদি শাস্তভাবে, না দৌড়ে খুঁটিয়ে দেখা হয়, তাহলে এই দেখতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তা ছাড়া সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার পর সব মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়।

আর বড় বৃত্তে, আংকোরথোম ছাড়িয়ে আরও দূর দিয়ে ঘুরিয়ে অন্য মন্দিরগুলো দেখাবে, যার মধ্যে আছে প্রিয়া খান, নিক পিন, টা সোম, হয়ে ইস্ট মেবোন ঘুরে প্রি রুপ। এ ছাড়া সেন্ট্রাল আংকোরথোম-এ আছে, বায়োন মন্দিরের কাছে, টেরাস অফ এলিফ্যান্টস, টেরাস অফ লেপারস কিং বা বাফুওন। অর্থাৎ দুদিনেই পনের ডলার করে। রাজি হলাম। এছাড়া ছিল টোনাল স্যাপ টুর, যেটা ওরা বলল আলাদা যেতে হবে। বললাম সেটা পরে ভাবা যাবে। কথাবার্তা হয়ে গেল ম্যানেজারের সঙ্গে। সে বলল, কাল সকালে তৈরি থাকবেন আটটায়। টুকটুক এসে যাবে। আর আজকে সন্ধ্যায় যান এখানে কাছেই একটা হোটেলে ট্র্যাডিশনাল কাম্বোডিয়ান নাচের সঙ্গে বুফে। হোটেলের নাম কুলেন রেস্টুরেন্ট (Koulen Restaurant)। আমাদের এখানে হলে টোটো ভাড়া হয়ত দশ টাকাও হত না, টুকটুকওয়ালা কিন্তু নির্বিবাদে পাঁচ ডলার চেয়ে বসল। হোটেল ম্যানেজারটিও তা সমর্থন করল। কী আর করি, নতুন এসেছি, কত দূর কিছু জানি না। দিলাম বাধ্য হয়ে। সে বলল আবার শেষ হলে এসে নিয়ে যাব। ওদের ভাষাও বুঝছি না, ইংরেজিও সবাই বোঝে না। যেটুকু বোঝে বা বলে তা দিয়ে কাজ চালানো মুশকিল। যাই হোক, কুলেন রেস্টুরেন্ট কাছেই।

পৌঁছে দেখি হোটেলের একটি ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আপ্যায়নের জন্য। নামতেই বলে, টেবিল বুকিং আছে? বললাম, নেই। ও তখন ভিতরে নিয়ে গেল। আমি তো ভিতরে ঢুকে হতভম্ব। এক বিশাল চত্বরে পরপর অনেক সারিতে চারজন, ছজন হিসাবে খাবার টেবিল সাজানো আছে। আর প্রত্যেক টেবিলে নম্বর দেওয়া আছে। আমাদের একটা টেবিলে নিয়ে বসাল। দেখি বিভিন্ন টেবিলে বিদেশিদের ভিড়। চারিদিক সুন্দর কম ঔজ্বল্যের নানা রঙের আলো দিয়ে সাজানো। সামনে একটি ছোট অথচ সুন্দর স্টেজ। বুঝলাম, এদের নামটা এতোই ছড়িয়েছে যে বিদেশিরা যারা এখানে বেড়াতে আসে

এখানে একবার টুঁ মেরেই যায়। সেভাবেই ব্যবস্থা আছে। এদের রেট একেবারে নির্দিষ্ট, বারো ডলার জনপ্রতি। তাতে বুফে ডিনার ও নাচ দেখা দুটোর দামই ধরা আছে। এছাড়া যদি কেউ কিছু নেয়, কোনো পানীয়, আইসক্রীম বা অন্য খাবার - তার দাম আলাদা। মেনুকার্ড টেবিলে দেওয়া আছে আর পাশে পাশে তৎপর ওয়েটাররা ঘুরছে হুকুম তামিলের জন্য। যখন চুকলাম তখন অত ভিড় ছিল না, কিন্তু ক্রমশঃ ভিড় বাড়তে লাগল। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান। পাশেই বুফের জন্য একটা জায়গা করা আছে। সেখানে যে কত দেশের আর কত রকমের খাবার আছে কে জানে! আমরা যতগুলো বুঝতে পারলাম নিয়ে আস্বাদ নিলাম। এদের মিষ্টিতেও মনে হল চালের আধিক্য বা চাল দিয়েই তৈরি। প্রথমে কিছু কাম্বোডিয়ার বাজনা হল। তারপর এখানকার বিখ্যাত অপ্সরা নৃত্য ও নানা স্থানীয় নাচ যেমন জেলেদের নাচ, নারকেল মালা দিয়ে নাচ এইসব ছ-সাতটা নাচ হল। খুব ভাল লাগল। তার মাঝেই ছিল খাওয়া দাওয়া। তবে অপ্সরানৃত্য সত্যিই সুন্দর। শিল্পীরা যে সাজে সেজেছে, মনে হল সত্যি অপ্সরাদের নাচই দেখছি। নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম এই পরিবেশে। মনে হচ্ছিল স্বর্গের নৃত্যসভায় হাজির হয়েছি আমি। সত্যি অপ্সরারা এদের থেকে সুন্দর হয় কিনা জানি না। এরা প্রায় বিগত পনের বছর প্রতিদিনই এই অনুষ্ঠান করে। অনলাইনেও এদের টেবিল বুকিং হয়।

'আংকোর ভাট' কথাটার মধ্যে আংকোর অর্থ শহর বা নগর। এই 'নগর' শব্দটি থেকেই আনগর বা আংকোর এসেছে। আর ভাট বা ওয়াট আমাদের মঠ বা মন্দিরের সমার্থক। ওদের জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের ভাষার আদি কী? ওরা বলল, সংস্কৃত। পরে আমি দেখেছি আমাদের অনেক শব্দের সাথে ওদের শব্দের মিল আছে। তার মধ্যে মরিচ শব্দটি ওদের ভাষাতেও একই 'মরিচ'। এরকম অনেক শব্দ, হয় কিছু পরিবর্তিত হয়ে বা অবিকৃত হয়ে ওদের ভাষায় আছে। ওদের ভাষার নাম খমের (khmer)। এটা হিন্দু ও বৌদ্ধদের ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ও পালির মিশ্রণে তৈরি।

পরের দিন সকালে আকাশ ঝকঝকে পরিক্ষার। মনটাও বেশ চকচকে। হোটেলের ম্যানেজার মং জানাল, আপনার টুকটুক হাজির। আমরা তৈরি হওয়ার আগেই দেখি টুকটুক এসে উপস্থিত। একটা ছেলে - বয়স বেশি নয়, ওই পঁচিশ মত হবে, সেই আজকের সারথি আমাদের। একটু দাঁড়াতে বলে ব্রেকফাষ্ট সেরে নিয়ে উঠলাম রথে। চারজনের সিটে তিনজনে আরাম করে বসলাম।

ছুটল রথ। রাস্তাঘাট মোটামুটি আমাদের সাধারণ শহরের মতই, তবে নোংরা নয়। শহরের বাইরেটা একটু গ্রাম্য ভাব। শহরের একটু বাইরে, বোধ হয় ৩-৪ কি মি দূরে একটা বড় মিউজিয়ামের সামনে টিকিট কাউন্টারে নিয়ে গেল। এরকম টিকিট আমি আগে দেখিনি। কাউন্টারে একটা ক্যামেরা লাগানো আছে। তার দিকে চোখ রেখে দাঁড়াতেই একেবারে ফোটোসমেত টিকিট এসে গেল। কাজেই প্রত্যেককে আলাদা করে টিকিট কাটতে হল। একজন যে একসঙ্গে তিন-চারটে টিকিট কেটে নেবে. তা হবে না।



যাই হোক, টিকিট হয় একদিনের, নয় তিন দিনের। একদিনের টিকিটের দাম সাঁইত্রিশ ডলার, তিনদিনের বাষটি ডলার ও সাত দিনের বাহাত্তর ডলার। ক্রেডিট কার্ডেও কাটা যায়। পুরো আংকোরথমে যত মন্দির আছে সব কিছু দেখার জন্য এই টিকিটটা লাগবে। তাই যে কদিন ওখানে দেখার জন্য ঘুরব টিকিটটা সবসময় সঙ্গে রাখতেই হবে। প্রত্যেকটা দর্শনীয় স্থানে এটা দেখতে চাইবে। দামটা একটু অস্বাভাবিক বেশি মনে হল। কী আর করা যায়, চিনেও দেখেছি মনাস্ট্রিগুলোতে ঢুকতে অনেক টাকা লাগে। তিনদিনের টিকিট নিলাম বাষটি ডলার করে। কাছেই একটা চেকপয়েন্টে টিকিট চেক করিয়ে এগোলাম। নীল আকাশে মেঘ ভেসে বেডাচ্ছে, চারিদিকে সবুজের মেলা - গাছে গাছে।



প্রথমেই গেলাম আমার বহুদিনের স্বপ্ন আংকোরভাটে। দূর থেকে তার চূড়া দেখে মন এক অভূতপূর্ব চরমপ্রাপ্তির আবেশে ভরে উঠল – এর কথা এতদিন দূর থেকে শুনেছিলাম, বইয়ে পড়েছি, মনে মনে কত ছবি এঁকেছি। সেই আংকোরভাট, মনে এল ছেলেবেলায় পড়া ছন্দের জাদুকরের সেই অবিসারণীয় পদ -

"স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে

বরভূধরের ভিত্তি

শ্যাম কম্বোজে ওঙ্কার-ধাম

মোদেরই প্রাচীন কীর্তি।"

চারধারে গাছে ঘেরা, গাড়ি রাখার জায়গায় এসে চালক বলল, একটা গাইড নিয়ে নিন, বুঝতে সুবিধা হবে। নিলাম পনের ডলার দিয়ে।



এগিয়েই দেখি এক বিরাট খাল বা পরিখা দিয়ে ঘেরা অদূরেই হাতছানি দিচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দির (বর্তমানে বৌদ্ধ মন্দির)। পার হলাম এক ভাসমান প্লাস্টিকের ব্রিজের ওপর দিয়ে। পাশে রয়েছে পুরানো আদি ব্রিজ, যা এখন নাকি জাপান সরকার পুনর্নির্মাণ করছে। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই পরিখা কেন? বলল, মন্দিরটাকে স্বর্গ ভাবা হয়। তাই

কষ্ট করে মর্ত্যের জল পেরিয়ে স্বর্গ লাভ করতে হবে। আসল তথ্য যা পণ্ডিতেরা বলেছেন তা হল –

এই যে বিশাল মন্দির, এর নির্মাণকাজে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন স্যাণ্ড স্টোন বা বেলেপাথর লেগেছিল যেগুলোর প্রত্যেকটা ছিল প্রায় এক দশমিক ছয় টন। এগুলো আনা হয়েছিল ৫৫ মাইল দূরের কুলেন পাহাড় থেকে। এই বিশাল পাথরের আমদানি করতে তাদের সহজ রাস্তা নিতে হয়েছিল - তা হল জলপথে। এইজন্য তাদের অনেক খাল কাটতে হয়েছিল। এই খালেরই অবশিষ্ট হল বর্তমান খাল। এছাড়াও শহরে বেশ কিছু খাল এখনও রয়েছে আর বাকী অনেক বুজে গেছে। খালের ধারে অনেক জায়গায় একই পাথর পড়ে থাকা দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা সহজ হয়েছে। পাথরগুলি মনে হয় যেখানে কাটা হয়েছে সেখান থেকেই মাপ ঠিক করে আনা হয়ে ছিল, এখানে এনে পরে কাটা হয়নি। প্রতিটা পাথরে ছোট ছোট গর্ত আছে, যেটা দেখিয়ে গাইড বলল এই গর্তগুলো দিয়ে ধরে পাথরগুলো আনা হয়েছে। পাথরগুলো আনতে দশ ঘণ্টা করে সময় লেগেছে এই রাস্তায় – নাহলে হয়তো আরও সময় লাগত। এতেই প্রায় তিন লক্ষ লোক ও ছহাজার হাতির প্রয়ত্রিশ বছর সময় লেগেছিল মন্দিরটা তৈরি করতে। অঞ্চলটা দীর্ঘদিন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। তবে এর আবিক্ষার নিয়ে বহু মত আছে। একদল বলেন, ফরাসী প্রকৃতিবিদ হেনরি মহুত ১৮৬০ সালে একে আবিক্ষার করেন। আর একদল বলেন, না, আংকোরভাট কখনও হারায় নি, কাজেই আবিক্ষারের প্রশ্ন নেই। তবে অন্যান্য মন্দিরগুলো দেখলে বোঝা যায়, যেভাবে আজ তারা বড় বড় গাছের শিকড়ের তলায় প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে, তা দীর্ঘদিন অবহেলিত এবং লোকচক্ষুর আড়ালে না থাকলে সম্ভব হত না।

গাইড দেখাচ্ছিল, যে সেতু দিয়ে পেরোচ্ছি তা অস্থায়ী সেতু। পাশেই পুরানো আসল সেতু যেটার নাম স্পীয়ান হার্ল। সেটা এখন জাপানের সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মেরামত করছে। দু-এক বছর বাদে মেরামত হলেই খুলে দেওয়া হবে। ১৯০ মিটার চওড়া খালটির ওপর বর্তমানে যে ভাসমান প্লাস্টিকের সেতু আছে, সেটিও বেশ মজবুত।



ঢোকার মুখেই গাইড দেখাল, বন্দুকের গুলির দাগ, আমেরিকানদের আক্রমণের চিহ্ন, যেমনটি দেখেছিলাম অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। প্রবেশপথের মুখেই দেখি কয়েকটি তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে পোষা হাতির কানের মত পাতার খড়খড় আওয়াজ তুলছে। ঢুকলাম পশ্চিমদ্বার দিয়ে। মন্দিরের চারদিকে চারটি দরজা আছে। এই দিকটাতে পাশাপাশি দুটি মন্দিরের মত দরজা আছে, মাথাগুলো দেখে মনে হল কোনো কারণে ভেঙে ছোট হয়ে গেছে। গেট দিয়ে ঢুকে দেখি চওড়া সুদীর্ঘ বাঁধানো পথ চলে গেছে সোজা মন্দির পর্যন্ত। দুপাশে সবুজ ঘাসেভরা মাঠ, মাঝে মাঝে কিছু তাল গাছ রয়েছে। অনেকে দেখলাম তাল রস বিক্রি করছে। তবে, তখন যা বেলা আর রোদ, সে রস আর সাধারণ রস নেই, নিশ্চয় মদিরায় পরিণত হয়েছে। সে রসের রসিক নাগর নই, অগত্যা এগোলাম বাঁধা রাস্তা ধরে। গাইড দেখাচ্ছিল, প্রতি পাথরের ওপর নির্দিষ্ট দূরত্বে কিছু ফুটোর দিকে। বলল, এই ফুটোগুলো দিয়ে পাথরগুলোকে কুলেন পর্বত থেকে এখানে আনা হয়েছে। একটু এগোতেই দেখলাম রাস্তার দুপাশে দুটি পরিত্যক্ত মন্দিরমত। সেগুলো নাকি ছিল লাইব্রেরি। গোলাম দেখতে। আপাতত ফাঁকা পাথরের ঘর।



এখান থেকেই লক্ষ্য করতে লাগলাম এদের সিঁড়ির ধরণ। সব বেশ খাড়াই আর প্রতিটি ধাপ বেশ কম চওড়া। উঠতে কষ্ট হয় আর পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। বাঁধা রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের মাঠের ওপর দিয়ে চললাম। দুপাশে দুটি জলাশয় আছে। অন্যসময় পদাফুলে ভর্তি থাকে, এখন অল্প ছিল। চারপাশে অনেক তালগাছ রয়েছে আমাদের দেশের যে কোনো গ্রামের মত। বাঁদিকের জলাশয়ের পাশে কিছু দোকান আছে - ছবি বা হাতের কাজের। সেদিকে না দেখে এগোলাম সামনের দিকে, যা দেখতে এতদূরে ছুটে এসেছি।



মূলমন্দিরের বাঁদিকের দরজা দিয়ে ঢুকলাম। অবশ্য বাঁধা রাস্তা যেমন এসেছে তেমন প্রধান দরজা দিয়েও ঢোকা যায়। ঢুকে দেখলাম দেওয়ালে পুরো রামায়ণের ছবি চিত্রিত করা। হনুমান, বানরসেনা, রাম রাবণ সবাই রয়েছে। তবে এখানে রাবণের মাথা পাশাপাশি নয় ওপরে ওপরে। ছবিগুলো ঠিক খোদাই নয়, পাথরের ওপর ছেনিজাতীয় কিছু দিয়ে রেখা ছবি। দেওয়াল জুড়ে চলেছে এই ছবি। তবে কোন কোন জায়গায় বেশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। গোটা মন্দিরটাই বেলে পাথরে তৈরি। সেকারণে এবং সঠিক যত্ন না নেওয়ার জন্য চতুর্দিকে মসজাতীয় শ্যাওলায় মন্দিরে প্রাচীনত্বের ভাব বেশি করে ফুটে উঠেছে।





বাঁদিক থেকে এগিয়ে প্রধান দরজার দিকে এলাম বারান্দা দিয়ে। সামনেই অষ্টভুজ এক দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। এরকম বুদ্ধমূর্তি আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মূর্তির রঙ কালো। গায়ে সোনালি হলুদ রঙের এক টুকরো কাপড় উত্তরীয়ের মতো দেওয়া আছে।



গাইডকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, এটা আসলে বিষ্ণুমূর্তি ছিল। যখন এই মন্দির বৌদ্ধমন্দিরে পরিবর্তিত হয় তখন সমস্ত মূর্তির মাথা কেটে বুদ্ধের মাথা লাগানো হয়েছে। ফলে এক জগাখিচুড়ি তৈরি হয়েছে। ধর্মের লড়াই বা রাজনৈতিক লড়াইতে পড়ে শিল্পের কেমন অপমৃত্যু হয় তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আংকোরভাট মন্দির। পরে লক্ষ্য করেছি শুধু এখানে নয় সারা সিয়েম রিপ জুড়েই এই অবস্থা।

রাস্তার ধারে যেখানেই কোনো নালা বা ছোট খালের ওপর ব্রিজ আছে, সেগুলির রেলিং হিসাবে সমুদ্রমন্থনের ছবি অনুযায়ী একটা নাগের (বাসুকি) দুদিক ধরে, একদিকে দেব ও অন্যদিকে অসুর টানছে। ফলে নাগ রেলিং-এর কাজ করছে। এখানেও দেব বা অসুরের মাথা পালটানো আছে।

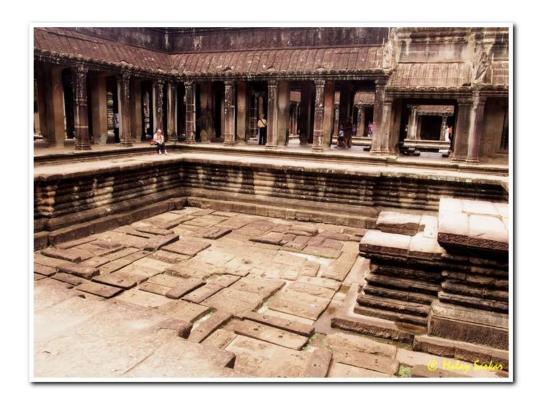


পরে জেনেছি, এই অষ্টহস্ত বিষ্ণুর কল্পনা ভারতের দাক্ষিণাত্যের রীতি। যেহেতু এখানে একসময় দাক্ষিণাত্যের রাজারা (৩য়- ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত পল্লব রাজা এবং ৯ম-১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত চোল রাজারা) রাজত্ব করেছেন, তাই এখানকার ভাষা, লিখণ শৈলী, স্থাপত্য, সংস্কৃতি সমস্তই দাক্ষিণাত্য প্রভাবিত।

এবার এগোলাম সামনের দিকে। চতুর্দিকে স্থাপত্য রক্ষা করার দুর্বল প্রচেষ্টা। মধ্যে মধ্যে কাঠের খুঁটি বা ওইধরণের কিছু দিয়ে ঠেকা দেওয়া আছে। মনে হল যে কোনো মুহূর্তে এটা পড়ে যেতে পারে।



মন্দিরটা চৌকোণা ধরণের। চারদিকে করিডোর আছে। দাক্ষিণাত্যের রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক তলায় মাঝখানে জলের কুণ্ড আছে। তিনতলা মন্দির। ওরা বলল, নীচের তলাটা পাতালের রূপক, মাঝের তলাটা মর্ত্য ও একেবারে ওপরের তলাটি স্বর্গ। সেখানে আসল দেবতার অধিষ্ঠান। মন্দিরটি বিষ্ণুর অবস্থান, মেরুপর্বতের অনুকরণে তৈরি। চারধারে চারটি চূড়া আর মাঝে একটি সবথেকে উঁচু চূড়া।



দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন ভঙ্গীর নৃত্যরতা অপ্সরার মূর্তি খোদিত। সেগুলি কাম্বোডিয়ার রীতি অনুযায়ী পোষাকে এবং মুকুটে সজ্জিত। মূর্তিগুলি একেবারে জীবন্ত।





দু-একটি জায়গায়, যদিও খুবই অল্প, ছাদের সিলিং-এ রঙের কাজ দেখলাম। যেখানে যা মূর্তি আছে বা খোদাই আছে সব কিছুতেই হিন্দুত্বের ছাপ স্পষ্ট।



এখান থেকে দ্বিতলে উঠলাম। সিঁড়ি তুলনায় অনেক প্রশস্ত তবে পা রাখার জায়গাটি সরু। ফলে সাবধানে উঠতে হল। উঠে দেখলাম অনেক জায়গায় মেরামতি চলছে। আর তাছাড়া মূল তৃতীয় তলটি দ্বিতীয় তল থেকে সোজাসুজি ওঠেনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে মূল মন্দিরের মাঝে বেশ খানিকটা চত্বরমতো আছে চারিদিকে।



তবে এখানে যে তৃতীয় তলে ওঠার সিঁড়ি দেখলাম তাতে বুঝলাম যে, আমার আর স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা হল না। সে কী সক্ষ সক্ষ আর খাড়াই সিঁড়ি আমি জীবনে কখনও দেখি নি। বুঝতে পারলাম না এই সিঁড়ি যারা ব্যবহার করত, তাদের কি কেউ বুড়ো হত না বা পড়ে যাবার ভয় থাকত না! এমনকী রাজা বা মেয়েরা কী করে উঠতেন! মন্দিরের দুদিকেই একই ধরনের সিঁড়ি এবং আরও আশ্চর্য, সিঁড়ির দুপাশে ধরার কোন রেলিং নেই। গাইডকে জিজ্ঞাসা করতে যা বলল, বিশ্বাস হল না। বলল, স্বর্গে ওঠার রাস্তা তো সহজ হয় না, তাই এই ব্যবস্থা। আর সবাই দুহাত দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠতেন। তবে এই ব্যবস্থার কারণ বা ওঠা নামার কোন সহজ উপায় বোধগম্য হল না। খাড়াই উঁচু সিঁড়ি আমি ব্যাংককেও দেখেছি – কোন কোন জায়গায় ওঠা নামাতে বেশ ভয় লাগছিল। কিন্তু এখানে দেখলাম এই সিঁড়িতে ওঠা অসন্তব। তখন বুঝলাম এই মন্দিরের সিঁড়ির ধরণ থেকেই এখানকার বাড়িগুলির ওই খাড়াই সিঁড়ির ধারণা এসেছে। তবে গাইডের ওই স্বর্গে ওঠার

যুক্তিটা ঠিক নয়, কারণ ছোট বড় সব মন্দিরেই এই ধরণের সিঁড়ি আছে। সুতরাং এর অন্য কারণ আছে যা হয়ত এদের জানা নেই। কিন্তু মন্দিরের পিছনদিকে গিয়ে ভুলটা একটু ভাঙল। কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছেন সমস্যাটি কী। তাই পিছনদিকে অপেক্ষাকৃত কম খাড়াই একটি কাঠের, হাতলওয়ালা সিঁড়ির ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রহরী আছে সেটির ব্যবহার সীমিত করার জন্য। তারা একসঙ্গে বেশি লোককে উঠতে দিচ্ছে না। টুপি পরে যাওয়া নিষেধ। জামাকাপড়েরও বিধিনিষেধ আছে। ছোট মিনি স্কার্ট পরে যাওয়া যাবে না। আমি তো সেটিতেও বেশ ভয়ে ভয়ে উঠলাম। এই রকম সিঁড়ির ব্যবস্থা আরও কয়েকটি জায়গায় দেখেছি। আর যেখানে নেই সেখানে উঠতে পারি নি। মন্দিরে দ্বিতলে ত্রিতলে বেশ কয়েকটি অন্ধকার ঘরে বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। তেমন আড়ম্বরে না হলেও মনে হল সেগুলিতে পূজা হয়। বেশ কয়েকটি মূর্তির হয় মাথা কাটা বা ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই ব্যাপার রোমে সিন্টিন চ্যাপেলেও দেখেছি। পৃথিবীর বহু জায়গায় এই ভাবে শিল্পের অমর্যাদা করা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। নিরীহ মূর্তিগুলি নম্ভ করায় কী বীরত্ব প্রকাশ পায় জানি না। মন্দিরের স্বর্গে বা ত্রিতলে উঠে যে কী অদ্ভুত আনন্দ হল তা বলে বোঝাতে পারব না। মনে হল জীবনের একটা অনেক বড় না দেখা জিনিসের আস্বাদন করলাম। চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, দিগন্তে দেওয়াল আর ঘন সবুজ গাছের পরিধি। নামতে ইচ্ছা করছিল না। বলা হয়নি, গাইড ছেলেটি তিনতলায় ওঠার আগেই তার প্রাপ্য নিয়ে বিদায় হয়েছে।

এবার বলি এই মন্দির সম্বন্ধে যা জানা গেছে, অল্প কথায়। এই মন্দিরের একটি অদ্ভূত ব্যাপার হল, যা অন্য কোথাও হয় না, মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। ফলে মনে করা হয় এটি পূজার জন্য নয়, রাজাদের মৃত্যুর পরে পারলৌকিক কৃত্য করার জন্য তৈরি হয়। মৃতের ভস্মাবশেষ রাখার মত কিছু কলস পাওয়া গেছে। তা থেকে এই ধারণা হয়েছে। এ ছাড়া ধারণা হচ্ছে বিষ্ণুর আবাসস্থান, মেরু পর্বত পশ্চিমে, তাই এটি পশ্চিমমুখী। তবে এই মন্দিরে পূজা হওয়ার পক্ষে বেশি সমর্থন মেলে নি। খমের রাজারা কোন কারণে এই শহর পরিত্যাগ করে মেকং নদীর ধারে নম্পেনে চলে যাওয়ায় দীর্ঘদিন এই মন্দিরশহর পরিত্যক্ত হয়ে জঙ্গলে পরিণত হয়। পরে ১৮৬১ সালে ফরাসিদের হাতে পুনরাবিষ্ণার হওয়ায় আবার এটি প্রাণ পায়। তৈরি হয়েছিল দ্বাদশ শতান্দীতে রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের রাজত্বকালে।

বেরিয়ে এলাম স্বপ্নের মন্দির থেকে। বাইরে এসে ডাব খাওয়া হল। এত বড় ডাব আমি কোথাও দেখিনি। এক-একটা ডাব এক ডলার। তবে তার যেমন জল তেমন শাঁস। একটা ডাবের জল আর শাঁস মিলিয়ে দু থেকে তিনজনের পেট ভরে যাবে। তৃপ্ত হৃদয় নিয়ে বের হলাম। তবে মনে হল যেন আগে পায়েস খেয়ে পরে তিতো সুক্তো খাওয়ার মত ব্যাপার হবে এরপর। অন্য মন্দির আগে দেখে নিয়ে পরে এখানে এলে হয়তো ভাল হত। আগেই প্রধান দর্শনীয় দেখে নিলে পরেরগুলোর আকর্ষণ কমে যায়।

~ ক্রমশঃ ~





অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক মলয় সরকার বর্তমানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষভাবে যুক্ত। এছাড়া পড়াশোনা ও লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। নেশা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ এবং উদ্যানচর্চা।



সিংহল দ্বীপে

অর্পিতা সরকার জানা

দিনটা ছিল ১৭ অক্টোবর,২০১৮। বিকেলবেলায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে বসেও ভাবতে পারছিলাম না যে আগামীকাল আমরা এই সময় ভিনদেশে থাকব!ভাবতে ভাবতে সময় হয়ে এল আকাশে ওড়ার এবং ইণ্ডিগোর বিমানে চেপে পৌঁছে গেলাম চেন্নাই। তখন বাজে রাত সাড়ে আটটা। পরের উড়ান ছিল ১৮ অক্টোবর, ২০১৮, সকাল সাড়ে ছটায় চেন্নাই থেকে রাবণ রাজার দেশের উদ্দেশ্যে।

প্রথম দিন

পা রাখলাম বন্দরনায়েক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। বেরিয়েই দেখতে পেলাম প্ল্যাকার্ড হাতে অপেক্ষা করছে ইকবাল, একাধারে সার্থি ও গাইড এবং আমাদের এই দশ দিনের সফরসঙ্গী।

প্রথম গন্তব্য ছিল সিগিরিয়া। এয়ারপোর্ট থেকে সিগিরিয়ার দূরত্ব ১৫০ কিমি। গাড়িতে উঠে আমাদের প্রথমে পৌঁছালাম ভুবনবিখ্যাত 'সিগিরিয়া রক' যার আরেক নাম 'লায়ন রক'। এটি একটি অপূর্ব সুন্দর গুহামন্দির। ছয়শত ফুট উঁচু এক পাথর কেটে দুর্ভেদ্য প্রাসাদ বানিয়েছিলেন রাজা -অনেকটা মৌচাকের মতো। বিশাল সিংহমূর্তির আদলের পাথরের প্রবেশপর্টির আনেকখানি এখনো টিঁকে আছে। প্রাগৈতিহাসিক এই গুহাটি প্রিষ্টপূর্ব ৫০০ শতান্দী থেকেই সাধু-সন্ম্যাসীদের আশ্রম হিসেবে ব্যবহৃত হত। শোনা যায় দক্ষিণ ভারতীয় রাজা কাশ্যপ কোনো যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ৪৯৫ প্রিস্টাব্দ নাগাদ এখানে আশ্রয় নেন এবং সুরক্ষিত একটি দুর্গ গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে এটি বৌদ্ধদের মঠে পরিণত হয়। টোদ্দ শতক বৌদ্ধমন্দির হিসেবে পর্যন্ত ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এটি শ্রীলঙ্কার একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। একটি মিউজিয়ামও বিদ্যমান। বেরিয়ে এসে এলিফ্যান্ট সাফারি করতে করতে আবারও রকের অপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। এরপর গাড়ি পৌঁছে গেল 'ফ্রেসকো ওয়াটার ভিলা' — আমাদের প্রথম রাতের ঠিকানায়। সিগিরিয়া শ্রীলঙ্কার সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মাতালে জেলায় অবস্থিত। এখানে আমাদের দুরাত্রি থাকার পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় দিনটি কাটলো আশেপাশের স্থানাদিদর্শনের মধ্য দিয়ে - কান্দালামা লেক (Kanadalama Reservoir)এবং ড্যাম, হেনরি বাটিকস, পোথানা এবং স্থানীয় গ্রামের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। ৬৯ ফুট (২১ মিটার) উঁচু এবং চওড়ায় ৫২০০ ফুট (১৬০০ মিটার) কান্দালামা রিজার্ভারটি সেচকার্যের জন্য নির্মিত হয়েছিল। পোথানায় গুহার ভিতরে গুম্ফা সত্যিই অতুলনীয়, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করেন এখানে। হেনরি বাটিকসে রয়েছে বাটিকের কারখানা। শ্রীলঙ্কার বাটিক জগৎ বিখ্যাত। যুরতে যুরতেই বাফে লাঞ্চ সেরে হোটেলে ফিরলাম বিকেলে। আগামীকালের গন্তব্য ট্রিক্ষোম্যালি।

তৃতীয় দিন

সিগিরিয়া থেকে ১০০ কিমি দূরে সমুদ্র তীরবর্তী ত্রিক্ষোমালী (Trincomalee) গোকারা বা গোকর্ণ নামেও পরিচিত, শ্রীলঙ্কার পূর্ব প্রদেশের (East Province) প্রধান বন্দর শহর। এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন শহর এটি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দ্বীপের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইতিহাসে একটি প্রধান সমুদ্রবন্দর হিসাবে কাজ করেছে। ইকবাল গাড়ি চালাতে চালাতে শ্রীলঙ্কার অনেক গল্প শোনাতে লাগলো। এরপর গাড়ি পৌঁছে গেল 'সি লোটাস পার্ক ' হোটেল ট্রিঙ্কোম্যালিতে। সৈকতের গায়েই হোটেল হওয়াতে ঘর থেকেই সোনালি বালুকাবেলার ওপর নীল জলের আছড়ে পড়ার দেখছিলাম।



হোটেলে পৌঁছে বেশি দেরী না করে লাঞ্চ সেরে ফেললাম আর সামান্য বিশ্রামের পর একটু ফ্রেশ হয়েই আবার বেরিয়ে পড়লাম লোকাল সাইট সিইং-এর জন্য। প্রথমেই গেলাম কোণেশ্বরম মন্দিরে। হাজার স্তন্তের শিবমন্দিরটি পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। এছাড়াও এখানে ভদ্রকালী, গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য, রাবণ, মুরুগান (কার্তিক) ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা হয়। দ্রিক্ষোমালিতে আশেপাশের জায়গাগুলির মধ্যে ফোর্ট ফ্রেডেরিক, গোকান্না রাজামহাবিহার অন্যতম।

বিকেলের স্ন্যাক্স হিসেবে ইকবাল এগ হপার্স (Egg Hoppers) নামের একটি নতুন খাবারের সঙ্গে পরিচয় করালো। ট্রিঙ্কোমালির সৈকতে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের অপরূপ দৃশ্যকে সাক্ষী রেখে বিদায় জানালাম শহরটিকে। পরবর্তী গন্তব্য ডাম্বুলা, রামবোডা হয়ে ক্যাণ্ডি।



চতৰ্থ দিন

সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম গন্তব্য ডামুলার বিখ্যাত কেভ টেম্পল। ডামুলা গুহা মন্দির শ্রীলঙ্কার সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মাতালে জেলায় অবস্থিত। ডামুলার এই গুহামন্দিরও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট -শ্রীলঙ্কার বৃহত্তম এবং সর্বাধিক সংরক্ষিত গুহা মন্দির কমপ্লেক্স। আশপাশের সমভূমিগুলির ওপরে শিলা টাওয়ার ১৬০ মিটার। আশিটিরও বেশি গুহা রয়েছে। প্রধান আকর্ষণ পাঁচটি গুহার, যাদের মধ্যে মূর্তি এবং ফ্রেন্কো (Fresco) রয়েছে। দেওয়ালচিত্র এবং মূর্তিগুলি মূলতঃ গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর জীবনের সাথে সম্পর্কিত। মোট একশ তিপান্নটি বুদ্ধের মূর্তি, শ্রীলঙ্কার রাজার তিনটি মূর্তি এবং বিষ্ণু এবং গণেশসহ চারটি দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। দ্বিতীয়টির মধ্যে রয়়েছে ম্যুরালগুলি ২১০০ বর্গমিটার (২৩,০০০ বর্গফুট) অঞ্চল জুড়ে।

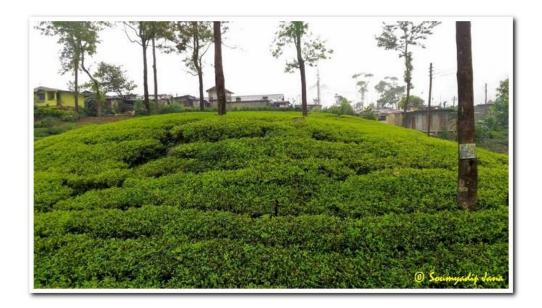


এছাড়াও আছে ডামুলার স্বর্ণ মন্দির যেখানে পৃথিবীর বৃহত্তম (১০০ফুট) বুদ্ধদেবের ধর্মচক্রপ্রবর্তন রূপের মূর্তিটি সত্যিই অতুলনীয়।

ভামুলা থেকে রামবোডার ওপর দিয়ে যাওয়ার পথে আমরা শ্রী ভক্ত হনুমান মন্দির দর্শন করলাম। সেখান থেকে গেলাম রামবোডা জলপ্রপাত। রামবোডা জলপ্রপাতিট ১০৯ মিটার (৩৫৮ ফুট) উচ্চ। এটি পুসেল্লাভা অঞ্চলে অবস্থিত।



এরপর গেলাম ডামরো চা ফ্যাকট্রিতে। চা পাতার প্রক্রিয়াকরণ করে কীকরে তাকে প্যাকেটজাত করা হয়ে থাকে তার সুন্দর বিবরণ পেলাম এবং দেখলাম। শ্রীলঙ্কার পার্বত্য অঞ্চল বলতে এই স্থানকেই বোঝায়। 'ডামরো লাবোকেলি টি লাউঞ্জে' ("DAMRO LABOOKELLIE TEA LOUNGE") বসে গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে সবুজ গালিচা মোড়া পাহাড়, উপত্যকা এবং চা বাগানের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রকৃতির কোলে হারিয়ে গেলাম। ইকবালের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। চার বাক্স চা কিনে গাড়িতে চেপে বসলাম স্পাইস গার্ডেন যাওয়ার উদ্দেশ্যে।



পথে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইকবাল সিংহলের বিখ্যাত কিং কোকোনাট (King Coconut) খাওয়ালো। কী মিষ্টি সেই ডাবের জল! কমলা রঙের সেই ডাবের জল একজনের পক্ষে শেষ করা সত্যিই দুক্ষর। তিনজনে মিলে একটা ডাবের জলপান করলাম!



শ্রীলঙ্কার এই মশলা উদ্যানগুলি এক অদ্ভূত অ্যারোম্যাটিক অভিজ্ঞতা। এখানে পনেরো ধরণের মশলা চাষ করা হয়;যার বেশিরভাগই বিশ্ব মশলাবাজারে রপ্তানি হয়। গোলমরিচ, হলুদ, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, আনারস, ভ্যানিলা, অ্যালোভেরা, কোকো এবং অন্যান্য গুলাগুলি নিয়মিত পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে। দুপুরের লাঞ্চ এখানেই সেরে ক্যাণ্ডি শহরে প্রবেশ করলাম।



ক্যান্ডি শ্রীলঙ্কার সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অন্যতম শহর। রাজধানী কলম্বোর পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এটি। শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজাদের সর্বশেষ রাজধানী ছিল ক্যান্ডি, বর্তমানে এটি সেন্ট্রাল প্রভিন্সের রাজধানী। পাহাড়ের পাদদেশে শহরটি গড়ে উঠেছে চা উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে। তাছাড়াও প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কারণে এ শহরের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে অন্যতম তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ক্যান্ডিতে রয়েছে সুবিশাল টুথ রেলিক (শ্রী দালাদা মালিগায়া) মন্দির (Temple of the Sacred Tooth Relic)। ১৯৮৮ সালে ইউনেস্কো এটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে।



পাশেই রয়েছে সুদৃশ্য ক্যান্ডি লেক। কথিত আছে গৌতম বুদ্ধের দাঁত এনে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন রাজকন্যা হেমামালী এবং তার স্বামী যুবরাজ দন্ত। কত যুদ্ধের এবং বৈদেশিক শক্তির আঘাত কাটিয়ে আজও সুন্দর,নিপুণ ভাস্কর্যের সাক্ষী এই মন্দির। লেকের জলে অসংখ্য বড় বড় মাছ খেলা করে চলেছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। চা-বিস্কুটের সঙ্গে ক্যান্ডির কালচারাল ডান্স দেখে আমাদের গাড়ি ছুটে চললো হোটেলের উদ্দেশ্যে।



পঞ্চম দিন

শৈলশহর ক্যান্ডি ছাড়ার আগে শহরটিকে আরেকটু দেখে নেওয়ার পালা। সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম "পেরাডেনিয়ার রয়্যাল বটানিক্যাল গার্ডেনিটি" দেখতে। প্রায় ১৪৭ একর জায়গা জুড়ে এই বাগানটিতে রয়েছে অসংখ্য অর্কিড, মশলা, মহৌষধি এবং খেজুর গাছ সহ ৪০০০ প্রজাতির বেশি উদ্ভিদ। এটি শ্রীলঙ্কার দীর্ঘতম নদী মহাভেলির কাছে অবস্থিত। আমাদের পুত্র আয়ুষ আজ এই অসংখ্য গাছের মাঝে সবুজ ঘাসে মোড়া মাঠে ছুটে দৌড়ে খুব মজা করেছে। অনেকক্ষণ সেখানে কাটালাম।



বটানিক্যাল গার্ডেন থেকে গেলাম 'স্টোরফিল্ড টি ফ্যাকট্রিতে'। একটা ট্রে-তে দশ রকম চায়ের কাপ নিয়ে এলেন এক শ্রীলঙ্কান মহিলা। বিভিন্ন রকম চায়ের (white tea, golden tea, green tea) খাঁটি গন্ধ এবং স্থাদ বিনামূল্যে উপভোগ করলাম। এক ব্যাগ হোয়াইট টি কিনে ফেল্লাম।

এরপর আমাদের গাড়ি তীরবেগে ছুটে চললো নুয়ারা এলিয়ার দিকে। শ্রীলঙ্কার সেন্ট্রাল প্রভিন্সের পার্বত্য অঞ্চলের নুয়ারা এলিয়াকে বলা হয় 'লিটল ইংল্যাণ্ড'। ১৮৬৮ মিটার (৬১২৮ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত এই শহর শ্রীলঙ্কার শীতলতম অঞ্চল হিসেবেও পরিচিত। এটি নুয়ারা এলিয়া জেলার প্রশাসনিক রাজধানী। চারিদিকে চা বাগানে ঘেরা পাকদণ্ডী রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছলাম গন্তব্যে। হিমঠাণ্ডার মধ্যেই রেস কোর্স,মনাস্ট্রি আর কুয়াশায় ঘেরা গ্রেগরি লেকের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে 'ইন্ডিয়ান সামার' রেস্টুরেন্টে পেটপুজো করে পোঁছে গেলাম আজ রাতের ঠিকানায়। দূরের পাহাড়ে দোকান, বাড়ি, হোটেলের অসংখ্য আলো জোনাকি পোকার মতো জ্বলছে। ডিনার সেরে শুয়ে পড়লাম শৈলশহর নুয়ারা এলিয়াকে শুভরাত্রি জানিয়ে।

ষষ্ঠ দিন

আজ আরো এক লম্বা সফরের পালা। নুয়ারা এলিয়া থেকে এল্যা হয়ে ইয়ালা জাতীয় উদ্যানে যাব। আমাদের হোটেল তিস্সামাহারামাতে। শ্রীলঙ্কার সাদার্ন প্রভিন্সের (Southern Province) হাম্বানটোটা জেলার তিস্সামাহারমা থেকেই ইয়ালা জাতীয় উদ্যানের সূচনা।

নুয়ারা এলিয়ার কনকনে ঠাণ্ডায় গরম গরম ব্রেকফাস্ট সেরে প্রথমেই এলাম সীতা এলিয়া। এটিই রামায়ণের অশোক বাটিকা। রাবণ রাজার খাসতালুক। কথিত যে সীতাহরণের পর লক্ষেশ্বর তাঁকে এখানেই এনে রেখেছিলেন। এখন সেখানে সীতামায়ের ছোট এক মন্দির। চারদিকে অসংখ্য বানর খেলে বেড়াচ্ছে। পাশেই সবুজ পাহাড়। সেখানে থেকে উপচে পড়া ঝরনা নীচে এক খরস্রোতা নদীর সৃষ্টি করে স্থানটির নিস্তব্ধতা হরণ করেছে। বলা হয় অশোক বনে থাকাকালীন এখানেই সীতামা স্লান সারতেন। হনুমানের সুবিশাল পায়ের ছাপও দেখলাম। মিছরি দিয়ে পুজো দিলাম সীতামায়ের মন্দিরে।

সেখান থেকে হাকগালা বটানিক্যাল গার্ডেন হয়ে গাড়ি পৌঁছালো এল্যাতে। এল্যা যাওয়ার রাস্তার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। সবুজ পাহাড়, সাদা মেঘরাশি এবং চা বাগান এক মোহময়ী জগতে নিয়ে যায়। গাড়ি এসে দাঁড়ালো রাবণ ফলসে (Rawana Falls)। এটি প্রীলঙ্কার একটি জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান। জলপ্রপাতটির উচ্চতা প্রায় ২৫ মিটার (৮২ ফুট)। দৃষ্টিনন্দন এই জলপ্রপাতে বেশ খানিক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চললাম। পথে লাঞ্চ সেরে নিয়ে অবশেষে পৌঁছে গেলাম "ওক রে লেক রিসর্ট" তিস্সামাহারমাতে - সুবিশাল তিস্সা লেকের গায়েই। হ্রদটি কৃত্রিমভাবে নির্মিত হ্রদটি অত্যাধনিক সেচ ব্যবস্থার একটি অংশ।

ভারত মহাসাগরের সীমান্তবর্তী ইয়ালা (রুহুনা) জাতীয় উদ্যান শ্রীলঙ্কার সর্বাধিক দেখা এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান। ৯৭৯ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে পার্কটি অবস্থিত। ২০০৪ সালের সুনামিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এটি। বিকেলে জাঙ্গল সাফারি করলাম। নিজস্ব গাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। বিশালাকৃতি জিপগাড়িতে চেপে তিনজনে চললাম জঙ্গলের কোর এরিয়াতে। উদ্যানের ব্লক-১ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বিভিন্ন ধরণের বন্য প্রাণী যেমন ভালুক, শ্রীলঙ্কান চিতা, শ্রীলঙ্কান হাতি, বাইসন, বুনো শুয়োর, হরিণের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। হাতি, বাইসন, হরিণ, বিভিন্ন রকমের সরীসৃপ, কুমীর আর নানারকমের নাম না জানা পাখি দেখলাম। জলাভূমি, গুলোর জঙ্গল,দিঘি, লেগুন, ম্যানগ্রোভে ঘেরা এক অসন্তব সুন্দর উদ্যানের স্মৃতি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ডিনারের পর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম রাতের তিস্সালেকের মোহময়ী রূপ।

সপ্তম দিন

আজ তিস্সামাহরমা থেকে ট্যাংগেল (Tangalle) হয়ে ১৫০ কিমি দূরে গালে শহরে যাব। শ্রীলঙ্কার অন্যতম প্রধান শহর গালে সাদার্ন প্রভিন্সের প্রশাসনিক রাজধানী ও গালে জেলার রাজধানী। ইবনে বতুতার সমসাময়িক কাল থেকেই দ্বীপরাষ্ট্রটির প্রধান বন্দর হিসেবে পরিচিতি পায় গালে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজদের স্থাপত্যশৈলীর উজ্জ্বল নিদর্শনক্ষেত্র এটি। ১৬৪৯ সাল থেকে ওলন্দাজরাও এ শহরের প্রাচীরকে বিস্তৃত করেছে। ইউরোপীয় দখলদার কর্তৃক নির্মিত এশিয়ার অন্যতম বিশাল দুর্গ হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট গালে ফোর্ট। গালেতে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণতম প্রান্তে ভারত মহাসাগরের নীল সলিল রাশির সামনে দাঁড়িয়ে এক অনবদ্য অনুভূতি হল। গালে দূর্গ, গালে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, ওলন্দাজদের পুনর্নির্মিত চার্চ, লাইট হাউস ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান দেখলাম। দুপুরের খাওয়া সারা হল গালে-তে।



শ্টিল্ট ফিশিং একটি অদৃশ্য নৈপুণ্য। ঝোড়ো সমুদ্রের মাঝখানে খুঁটি পোঁতা আর সেই খুঁটির ওপরে মৎস্যজীবীরা বসে মাছ ধরে চলেছে। সূর্যাস্তের সময় গালের সমুদ্র সৈকতে সেই স্থবির মৎস্যজীবীদের কার্যকলাপ দেখলাম। পথে নজরে পড়ল সুনামিতে মারা যাওয়া অসংখ্য মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত বামিয়ান বুদ্ধমূর্তিটি।



পরের গন্তব্য বেনটোটা। আমাদের হোটেল 'ওশান কুইন' ওয়াদুয়াতে। এটি ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্সের (Western Provience)শহর। এখানে আমাদের দুরাত্রি যাপনের পরিকল্পনা। ওয়াদুয়ার সোনালি বেলে সমুদ্র সৈকত এবং উপকূলগুলি এই অঞ্চলের সর্বাধিক দৃষ্টিনন্দন স্থান। ওয়াদুয়া থেকে কলম্বো পর্যন্ত উপকূলরেখা বরাবর ট্রেনলাইন চলে গিয়েছে। সুন্দর হোটেলটি সমুদ্রের পাশেই। রাত্রে ডিনার সেরে সমুদ্রের চেউয়ের গর্জন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।



অষ্টম দিন

আজ বেনটোটা ঘুরে নেওয়ার পালা। বিভিন্ন রকম ফল, দুধ, বিস্কুট, লুচি, তরকারি, ওমলেট, পাউরুটি, চা, কফি, ফলের রস ইত্যাদি সমাহারে প্রাতরাশ সেরে প্রথমেই গেলাম মাডু ম্যানগ্রোভ রিভার সাফারি। এটি শ্রীলঙ্কার প্রধান আকর্ষণগুলির একটি। প্রচুর বানর, কাঠবেড়ালি, বিভিন্ন রকমের সরীসৃপ, সাপ, কুমীর, মাছরাঙা এবং পরিযায়ী পাখিদের বাস। ম্যানগ্রোভে ঘেরা অঞ্চলটিতে অসংখ্য দ্বীপ ছিল যার অধিকাংশই জলের নীচে চলে গিয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কিছু দ্বীপে মানুষ বসতিস্থাপন করেছে তবে সবগুলিই বন এবং গুলাদ্বারা আবৃত। বৃহৎ জনবসতিপূর্ণ একটি দ্বীপ 'কোথ দুওয়া'তে একটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। দ্বীপগুলির কোনোটা সাপেদের রাজ্য তো কোনোটি বাদুড়ের। সিন্নামন দ্বীপ (Cinnamon Island) আবার দারুচিনি গাছে ভর্তি। দারুচিনি গাছ থেকে কী করে দারুচিনি উৎপাদন হয় বুঝিয়ে বলছেন এক বৃদ্ধা এই দ্বীপে আগত সকল দর্শনার্থীকে।



'ফিস ফুট স্পা' এখানে খুবই জনপ্রিয়। একটি বড় জায়গা খুঁটির মধ্যে বাঁধা জাল দিয়ে ভাগ করা; সেই জায়গাতে ছোটো ছোটো কমলা রং-এর অসংখ্য মাছ এদিক ওদিক নির্দ্বিধায় মুক্ত। এর মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে থাকলেই ম্যাসাজ শুরু। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ভেতরে সরু সরু খাঁড়ি দিয়ে দুঘন্টা ঘুরে এলাম স্পিডবোটে।



এরপর গেলাম টার্টল হ্যাচারিতে। সমুদ্রের ধারে অসংখ্য ছোটো, বড়ো, নানা রঙের নানা জাতের কচ্ছপ (Oliver Ridley Turtle, Green Turtle, Hawksbill Turtle, Loggerhead turtle, Leatherback Turtle)। আহত, বৃদ্ধ,আবার কেউ দু দিনের বা দশ দিনের। এদের সেবা-শুশ্রমা করে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হোটেলে এসে লাঞ্চ সেরে সৈকতে বসলাম। বিকেলে সূর্যান্তের সময় কমলা আভা দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল।

নবম দিন

আর একদিন পরেই আবার নিজেদের দেশে ফিরবো। আমাদের শেষ গন্তব্য ছিল কলম্বো।



শ্রীলঙ্কার পশ্চিম উপকূলে কালানী নদীর মোহনায় অবস্থিত সমুদ্রবন্দর কলম্বো শ্রীলঙ্কার রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর। ওয়াদুরা থেকে কলম্বো আসতে আসতে রাস্তায় নানা জায়গায় কেনাকাটা করলাম। নভযুগ (Navayuga) নামে একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর ইকবাল আমাদেরকে নিয়ে গেল লাকশালা (Laksala) নামে হস্তশিল্পের এক বিশাল স্যুভেনির বুটিকে। এই বহুতল বিপণির এক-এক তলে রয়েছে এক-একটি বিভাগ, শ্রীলঙ্কার মুখোস, হস্তনির্মিত গহনা, সিলোন চা, হস্তশিল্প থেকে নকশাকরা পোশাক ইত্যাদি। রাত্রে হোটেলে প্যাকিং সেরে জলদি ডিনার করে নিলাম।



দশম দিন

আজ রাত্রি ৮।৩০টায় ইন্ডিগোর বিমানে আমরা চেন্নাই ফিরে যাব। সকাল সকাল উঠেই স্লান সেরে হোটেলে ব্রেকফাস্ট সারলাম। হোটেল ছেডে বেরিয়ে কলম্বোর স্থানগুলিকে দেখে নেওয়ার পালা।

প্রথমেই গেলাম রামকৃষ্ণ মিশন কলস্বোতে। এরপর গঙ্গারামায়া বৌদ্ধ মন্দির, গ্যাল ফেস গ্রীনের সুবিস্তৃত উপকূলরেখা, কলস্বো লোটাস টাওয়ার, অস্কারমায়া বৌদ্ধ মন্দির, খান ক্লক টাওয়ার ইত্যাদি দেখতে দেখতে হঠাৎ খবর পেলাম শ্রীলঙ্কায় সাংবিধানিক সন্ধটের কারণে ধর্মঘট ও নানা অশান্তির সূচনা হয়েছে। একটু দুশ্চিন্তাগ্রন্ত হয়ে পড়েছিলাম কারণ আজই আমাদের দেশে ফেরার বিমান।

ইকবাল তৎপরতায় এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে কোনো অসুবিধে হলনা। আলবিদা জানিয়েও বললাম 'আবার দেখা হবে'। আমন্ত্রণ জানালাম ভারতবর্ষে ঘুরতে আসার জন্যে। বিমানের সময় হয়ে গেলো দেখতে দেখতে। সমুদ্র, পাহাড় আর নারকেল গাছ ঘেরা ছোট্ট দেশটাকে মাটিতে রেখে হুশ করে আকাশে উঠে গেল প্লেনটা।





ভ্রমণই নেশা অর্পিতা সরকার জানার। সময় পেলেই স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে পড়েন অজানার উদ্দেশ্যে।

57 57 57 57

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

মত দিয়েছেন : গড় : 0.00

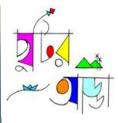
আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please <u>click here to download the Bangla Font</u> and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com © 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher



আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেডানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =



বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

বাঙলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন – গনগনি

শুভ্রা সরকার

কাজের ভিড়ে ভীষণভাবে যাঁতায় পিষে, রাত্রি কাটে ভবিষ্যতের দিন গড়ায়। একদিন তো আমিও ছিলাম অন্য রকম, একদিন তো আমিও ছিলাম খামখেয়ালি।।

রোজকার এই একঘেরে থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় গোছের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কেমন যেন যান্ত্রিক হয়ে গেছে। হাঁটুতে গেঁটে বাত বাসা বাঁধব বাঁধব করছে। মন বলছে সুতো ছাড়া ঘুড়ির মতো নিজের খেয়ালে উড়ে যেতে। তাতে বোধকরি কিছু সময়ের জন্য রেহাই পাওয়া যাবে এই শিকল বাঁধা যন্ত্র-জীবন থেকে। গায়েগতরে ব্যথাটাও যদি একটু কমে। তবে হাতে ছুটি বেশি নেই। তাই ঠিক করলাম একটা ছোটো একদিনের ট্যুর করবো। যেমন ভাবা তেমন কাজ। গন্তব্য পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা শহর আর তার কাছেই শিলাবতী নদীর তীরে গড়ে ওঠা বৃহৎ গিরিখাত গনগনি। ফেসবুকের পোন্টে এই জায়গার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। আমেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের এক মিনিয়েচার ভার্সন বলা হয়ে থাকে এটিকে। অ্যারিজোনার জায়গায় গনগনি আর কলোরাডোর জায়গায় শিলাবতী নদী। প্রকৃতির কোলে লাল মাটি দিয়ে

বাকে আচকো অ্যারজোনার জারগার গনগান আর কলোরাজোর জারগার নিলাবতা নদা। প্রফাতর কোলে লাল মাাচ দিরে তৈরি অপরূপ সৌন্দর্য ও ভাস্কর্য। কলেজে প্রথমে কেমিন্ট্রি ম্যাডামই এর উল্লেখ করেন, জারগাটাও বেশি দূর নর, তাই রাজি হয়ে গেল সকলেই। নীল আকাশের নিচে একটু পায়ে হেঁটে, শিলাবতী নদীকে সাক্ষী রেখে, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়'(থুড়ি কাশফুলের ছায়ায়) ফুরফুরে মেজাজে কাটিয়ে দেওয়া যায় গোটা একটা দিন। ব্যাস আর কি? প্ল্যান তৈরি, ঠিক হল দিনক্ষণ, তোলো ব্যাগ, চলো গনগিন। প্রথমেই বলে নিই আমাদের এই ঘোরাঘুরির একটা ছোটোখাটো 'যদি হও সুজন, তেঁতুল পাতায় নয়জন' গোছের টিম-ট্রুর আছে। তাতে সদস্যসংখ্যা নয় না হলেও ছয় তো বটেই। এর মধ্যে বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় বড়ো কেমিন্ট্রি ম্যাডামই হচ্ছেন আমাদের ট্রুর প্লানার-কাম-গাইড আর দ্বৈপায়ন হলো টিকিট বুকিং এজেন্ট-কাম-জুনিয়র ফটোগ্রাফার। এছাড়া ওই টুকটাক বাদাম, বিস্কুট, মিষ্টি, লস্যের যোগান যিনি স্বেচ্ছায় দিয়ে থাকেন তিনি হলেন আমাদের ফিজিক্স স্যার। বাকি দুজন হলেন তুহিনাদি আর সৌরভ স্যার। সৌরভ স্যার হলেন গিয়ে সিনিয়রমোন্ট ফটোগ্রাফার। বাকি আমরা দুজন নেহাতই এদের ছবির নায়িকা হতেই যাই আর কী! তো এই হলো গিয়ে আমাদের ছয় সুজন, যাদের নিয়ে আমাদের যাত্রা ভক্ত।

শরৎকালের এক ছুটির দিনে সূর্যোদয়ের আগেই ঘুমকে বিদায় জানিয়ে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘোরার নেশায়। বাগুইহাটিতে দেখা করার কথা আমাদের চারজনের - ফিজিক্স স্যার, ম্যাডাম, আমি আর ফটোগ্রাফার দ্বৈপায়ন। বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতেই কেমিস্ট্রি ম্যাডামের ফোন পেলাম, মিটিং পয়েন্টে প্রথম আগমন তাঁরই। বলাবাহুল্য এই ট্যুরের বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকাটিও এঁরই। হাঁটা লাগালাম বেশ জোরেই, পৌঁছে দেখলাম বাকি দুজনেই পৌঁছে গেছে। আমিই লেট-লতিফ। ঘোরার কথা এলে ম্যাডামের উৎসাহ ও উচ্ছাস যে কেউই পড়ে নিতে পারে। অগত্যা পৌঁছনোর প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থানের অধিকারিণী হয়েই নিজেকে তৃপ্ত রাখতে হল। ট্রেনের নাম আরণ্যক এক্সপ্রেস। শালিমার থেকে সাতটা পয়ঁতাল্লিশ মিনিটে ছাড়ার কথা। ওলা বুক করা হল শালিমারের উদ্দেশ্যে, মাঝপথে মেট্রোপলিটন অফিস মোড়

থেকে মাথা বেড়ে হল পাঁচ। আমাদের পঞ্চম সঙ্গী - তুহিনাদি। তুহিনাদির ভীষণ প্রিয় এই একদিনের ট্যুরগুলো। ওলা ছুটে চললো তীব্রগতিতে, তিলোন্তমার ভিড় শূন্য রাস্তায় যেন সে এক নতুন প্রাণ খুঁজে পেয়েছে। যথা সময়ে পৌঁছে গেলাম শালিমার ষ্টেশনে। এখান থেকে দলে যোগ দিলেন সৌরভ স্যার আর স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্সে সৌরভ স্যারের ডি.এস.এল.আর.। ট্রেনে উঠে প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্থান দখল করে বসে পড়ল। দলে সবথেকে ছোটো হওয়ার দরুণ জানলার ধারের সিটটাতে একছত্র অধিপত্য বিস্তার করে মনে মনে বেশ খুশিই হলাম। ট্রেনও চলতে শুরু করলো যথাসময়ে। ছয় বাঙালি একজায়গায় আর আড্ডা জমবে না, এমনটা ভাবাও পাপ! ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকল আমাদের গল্প। সময়ের হিসেব হারিয়ে হঠাৎ করেই চলে এল খড়গপুর। এখানে গাড়ি দাঁড়াবে মিনিট পনেরো। চায়ের কথা উঠতেই একবাক্যে সবার সম্মতি পাওয়া গেল, ওইযে কথায় আছে "বাঙালির চা-এ না নেই"। এরপর খড়গপুরের ধোঁয়া ওঠা আলুর দম আর ফিজিক্স স্যারের আনা কলা, মিষ্টি সহযোগে সারা হল প্রাতরাশের পালা। ট্রেন আবারও ছুটতে শুরু করল।

গড়বেতায় যখন নামলাম, ঘড়ির কাঁটা প্রায় সাড়ে এগারোটা ছুঁইছুঁই। হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল, টোটোগাড়িও বলা ছিল। টোটোতে চড়ে সোজা হোটেলে পৌঁছে ব্যাগপত্র রেখে, সফরের সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে মুছে আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে গেলাম যার জন্য এখানে আসা, সেই গনগনি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিছুদিন আগেও রাজনৈতিক খবরের শিরোনামে ছিল এই গড়বেতা। কিন্তু কালের নিয়মে রাজনৈতিক গড়বেতার পটভূমিকা পাল্টে গিয়ে হয়েছে গড়বেতা-গনগনি, প্রকৃতির এক অবিসারনীয় সৃষ্টি।



হোটেল থেকে টোটোতে করে মিনিট পনেরো লাগলো শিলাবতী নদীর ধারে পৌঁছতে। সূর্য্য তখন প্রায় মাথার ওপরে, যদিও আকাশ মেঘলা থাকায় তেমন কোনও অসুবিধে হল না। তবে ভাগ্যিস বৃষ্টি হয়নি সেদিন। লাল মাটির সরু রাস্তা দিয়ে চললাম আমরা, দুপাশে সারি সারি গাছ। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেল এগুলো নাকি কাজুবাদাম গাছ। ফল না থাকায় আমাদের পক্ষে তা যাচাই করা মোটেও সম্ভব ছিলনা। যদিও গাছ থেকে ছিঁড়ে কাজুবাদাম খাওয়ার ইচ্ছেটা একদমই হয়নি বললে নেহাত মিথ্যে বলা হবে। এই লালমাটির পথে সবুজের সারির মাঝে চলতে চলতে মনের ভেতর বেজে উঠছিল রবিঠাকুরের গান। খানিক পথ পেরিয়ে সিঁডি দিয়ে নেমে শিলাবতী নদীর তীর ওরফে গনগনি ডাঙা।

নদীর কোথাও হাঁটু জল, কোথাও কোমর পর্যন্ত। আদতে নদী শান্ত, বাঁধনহারা বেণীর মতো নিজের খেয়াল বশে এঁকে বঁকে চলেছে মনের খুশিতে। লালমাটির ছোট ছোটো টিবিগুলোর গা ক্ষয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক অপরূপ কারুকার্য, প্রকৃতি যেন নিজে হাতে খোদাই করেছে এ নকশা। উপরি পাওনা কাশফুলে মুড়ে থাকা নদীর তীর। প্রকৃতির কোলে লাল ল্যাটেরাইট মাটি আর সাদা চুনা পাথরে তৈরি খাঁজ, সবুজের সতেজতা আর নদীর দুপাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাদা কাশ ফুলের সারিবদ্ধ জঙ্গল চোখে না দেখলে গ্র্যান্ড-ক্যানিয়ন উপাধির সার্থকতা বুঝতে পারতাম না। কথিত আছে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় কিছুদিন এখানে বসবাস করেছিলেন। সেইসময় একদিন যুধিষ্ঠির নদীর পাড়ে এক ব্রাক্ষাণকে বসে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে নদীর অপর পাড়ে এক রাক্ষস আছে, নাম বক রাক্ষস। প্রতিদিন একজন করে গ্রামবাসীকে সে তার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং আজ তার পালা। এই কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে যুধিষ্ঠির ভীমকে পাঠান রাক্ষসবধের উদ্দেশ্যে। প্রবল যুদ্ধ হয় বকরাক্ষস ও ভীমের মধ্যে। আর এই যুদ্ধের ফলেই নাকি গনগনির ক্যানিয়নের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের দিক থেকেও এই স্থানের গুরুত্ব কিছু কম নয়। চুয়ার-লায়েক বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক অচল সিং ও তার দলবলকে এই গনগনির মাঠেই ফাঁসি দিয়েছিল ইংরেজরা।



দুচোখ ভরে প্রকৃতিকে আস্বাদন করে এবার এল এই স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখার সময়। শুরু হল ছবি তোলা। এ মহৎ কাজে প্রারম্ভিক ভূমিকা আমাদের সেই স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্সটি পালন করলেও, পরবর্তীতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল ফোনের ছোট ছোট ক্যামেরাগুলো। কাশবনের ভেতরে — বাইরে, নদীর হাঁটু জলে পা ডুবিয়ে, ক্যানিয়নের খাঁজে বসেদাঁড়িয়ে অনেক ছবি তোলার পর্ব শেষ করতে করতে বেলা পড়ে এলো। এবার ফেরার পালা। হাতে সময় আর বেশি নেই। পায়ে পায়ে হেঁটে উঠে এলাম শহুরে রাস্তায়, ততক্ষণে সবারই মোটামুটি খিদে পেয়ে গেছে। রাস্তার পাশে এক ভাতের হোটেলে ভাত খেয়ে আবার হোটেলে ফিরে আসা হল। খানিকটা বিশ্রামের পর বাড়ি ফেরার জন্য শুরু হল তোড়জোড়। বিকেলে ফিরতি আরণ্যক এক্সপ্রেসেই এই রাঢ়-বাংলা ফেলে ফিরে চলা আবার সেই কর্মব্যস্ত জীবনে, সঙ্গে নিয়ে একরাশ স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা।



পেশায় অধ্যাপিকা হলেও শুভ্রা সরকার নেশায় ভ্রমণিপিপাসু। আর এই ভ্রমণের স্মৃতিশুলোকে সংরক্ষিত করে রাখার জন্যই হাতে কলম তুলে নেওয়া। প্রিয়জনদের উৎসাহে নিমরাজি লেখিকার কোনো পত্রিকাতে লেখা পাঠানোর এই প্রথম প্রয়াস।



কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

মত দিয়েছেন : 1 গড় : 4.00

সিক্ষ রুটে

পঙ্গজ দত্ত

~ সিল্ক রুটের আরও ছবি ~

বছরতিনেক আগে সিকিমে সিল্ক রুটে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে। নিই।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে চারচাকায় পৌঁছেছিলাম লিংতাম নামক এক জায়গায়। যেতে সময় লেগেছিলো প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টা।

লিংতাম-এ 'বাসেরা' নামে এক হোম-স্টেতে সেই রাতটা কাটিয়ে পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম জুলুক-এর দিকে। জুলুক থেতে সময় লেগেছিল ঘন্টা তিন-চার। জুলুক-এ দুই রাত্রি থেকে আবার লিংতাম ফেরত আসি। সেখানে আবার এক রাত্রি থেকে চলে আসি রোলেপ। রোলেপ-এ এক রাত্রি থেকে কলকাতা ফেরত। তবে এই পুরো থাকাটাই কিন্তু হোম-স্টেতেই ছিলাম।



লিংতাম-এ থাকাটা এক দারুণ অভিজ্ঞতা। জানলা খুললেই পর্বতরাজি চোখের সামনে। আর ভোরবেলার সেই অপূর্ব দৃশ্য ভাষায় বোঝাতে পারবো না। পাহাড়ের ওপরে ভোরের সূর্যকিরণ পড়ে সে যে কী সুন্দর লাগে দেখতে, আহা! ভাবুন তো



জুলুকে আবার একটু বাইরে বেরিয়ে এসে দু'পা হাঁটলেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন চেয়ে আছে আমাদের দিকে। এক রাত জুলুক-এ কাটিয়ে পরের দিন সকালে বেরিয়েছিলাম সাইট-সিয়িং-এ। প্রথমে থামবি ভিউ পয়েন্ট-এ। এই থামবি ভিউ পয়েন্ট থেকেই দেখা যায় জুলুক এর হেয়ার পিন টার্নগুলো এবং যদি কপাল খুব ভালো থাকে আর আবহাওয়া পরিক্ষার থাকে তাহলে কাঞ্চনজঙ্খা রেঞ্জ। আমরা দুটোই দেখতে পেয়েছিলাম। ভিউ পয়েন্ট-এ কিছু সময় কাটিয়ে উঠে গোলাম নাথাং ভ্যালির দিকে। ভ্যালির দৃশ্য কিছুক্ষণ উপভোগ করে চলে গোলাম বাবা মন্দির-এ। ওখানে গিয়ে দেখি সেনাবাহিনির জওয়ানরা রয়েছে। আবহাওয়াও বেশ ঠাণ্ডা এখানে। জওয়ানদের ক্যান্টিনে একটু খাওয়াদাওয়া করে বাবা মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। মন্দির বলা হয় বটে, কিন্তু আসলে একটা 'বাঙ্কার'। বাইরে অত ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্কারের ভেতরটা কিরকম যেন গরম।



এই বাবা মন্দিরের সঙ্গে একটি কাহিনি জড়িয়ে আছে। বাবা হরভজন সিং ইন্ডিয়ান আর্মি তে চাকরি করতেন। ব্যাটালিয়ন-এর সঙ্গে অন্য জায়গায় মার্চ করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন গভীর খাদে। বলা হয় তিনি নাকি স্বপ্নে সহকর্মীদের এই মন্দির গড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। লোককথা বাবা হরভজন সিং এখনও নাকি ওই বাঙ্কারে নিয়মিত আসে্ন। বাঙ্কারে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। প্রত্যেকদিন ওঁর জুতো পালিশ করে ঠিক জায়গায় রাখা হয়, জামাকাপড় ইস্ত্রি করে রাখা হয়, এক গ্লাস কফিও রাখা হয় রোজ। এমনকি সরকার থেকে ওনার খাতায় বেতনও যায় প্রত্যেক মাসে। কিন্তু এত সব একটা মানুষের জন্য যে বেঁচে নেই! কেন! ওখানকার জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলে বুঝি যে এমন অনেক সময় হয়েছে এই বাবা হরভজন সিং ওনাদের অনেক কিছু থেকে বাঁচিয়েছেন এবং আগাম বার্তাও দিয়েছেন অনেক বিপদের। এই সমস্তকিছুর জন্য তাঁকে পুজো করা হয়। বাবা মন্দিরে এবং ভারতীয় জওয়ানদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে গোলাম এলিফ্যান্ট লেক দেখতে। লেকটার মুখের দিকটা ঠিক হাতির শুঁড়ের মতন। তাই এরকম নামকরণ। ওখান থেকে সোজা জুলুক চলে এসে সে রাতটা সেখানেই থাকা হল।



এরপর লিংতাম হয়ে চলে এলাম সোজা রোলেপ-এ - ঘন জঙ্গল আর তার মধ্যে হোম স্টে। ঠিক তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরনা। রাতে পোকা আর জলের আওয়াজ ছাড়া কিছু নেই। একটা ঝুলন্ত সেতু আছে রোলেপ-এ, সেটা দেখার জন্য বেশ অনেকটা হাঁটতে হয়েছিল। রোলেপ থেকে পরের দিন কলকাতায় ফেরার জন্য রওনা।



<u>~ সিক্ষ রুটের আরও ছবি ~</u>



হলদিয়ার আই ভি এল ধুনসেরি পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেডে কর্মরত পঙ্কজ দত্তের আগ্রহ ফটোগ্রাফি এবং অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ। তাঁর কথায়, জীবনে বাঁচার জন্য যেটাই করতে হবে ভালোবেসে করতে হবে, তাহলেই জীবনের মজা পাওয়া যাবে। জীবন ভারী সুন্দর।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

SocialTwist Tell-a-Friend

মত দিয়েছেন: 1 গড়: 4.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com © 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher